KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M T AMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication: 28 চৌরিঙ্গী রোড, কলকাতা-২৬
Collection: KLMLG	Publisher: আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত
Title: সমকালীন (SAMAKALIN)	Size: 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number: 22/- 22/- 22/- 22/- 22/-	Year of Publication: মাঘ ১৩৮০ ॥ Feb 1974 ফাল্গুন ১৩৮০ ॥ March 1974 বৈশাখ ১৩৮১ ॥ Sep 1974 কার্তিক ১৩৮১ ॥ Nov 1974 অগ্রহায়ণ ১৩৮১ ॥ Dec 1974
	Condition: Brittle Good
Editor: আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত	Remarks:

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

দ্বাবিংশ বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৮১

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অযথা
বিপদ-শৃঙ্খল
টানবেন না

অন্যদেরও
টানতে
দেবেন না

অপরিহার্য না হ'লে তুচ্ছ কারণে
কখনই বিপদ-শৃঙ্খল টানবেন না-
এতে নিয়মিত ট্রেন-চলাচল
বিপর্যস্ত হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

দ্বাবিংশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ তেরশ' একাশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

শ্রীজীব গোস্বামী ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ৩১১

অগ্নিপুরাণে নাট্যচিন্তা ॥ কৃষ্ণজীবন ভট্টাচার্য ৩১৭

পুরোনো আমলের নথি-পত্র ও দলিল-দস্তাবেজের ভাষা ॥ ত্রিপুরা বসু ৩২৪

মানভূমের কথ্যশব্দার্থ ॥ রামশঙ্কর চৌধুরী ৩৩১

কয়েকটি আঞ্চলিক লোকক্রীড়া ॥ কনককান্তি বসু ৩৩৬

আলোচনা : বইয়ের মলাট ॥ সন্তোষকুমার বসু ৩৪০

সমালোচনা : চণ্ডীদাস বিরচিত—শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন ॥ হারাধন দত্ত ৩৪২

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

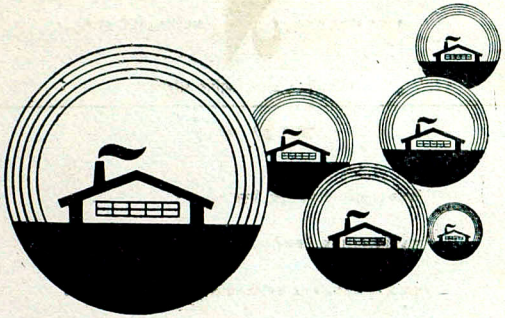

Making new industries bloom

Thirty years ago, manufacturing cars in India appeared to many like an idle dream. But Hindustan Motors ventured into this new field.

India is now self-sufficient in automobiles largely because of the pioneering efforts of Hindustan Motors. What is equally important, Hindustan Motors have helped to bring into existence a host of new ancillary industries employing tens of thousands of skilled technicians to manufacture the hundreds of components that go into the making of an automobile.

Over the past thirty years, these industries, brought into being by Hindustan Motors, have expanded, diversified and improved their range of manufactures to meet the demands of other automobile manufacturers not only in India but also abroad. Today one of the important items of export of the Indian Engineering industry are automobile components and accessories which bring in more than Rs. 15 crores in foreign exchange every year.

Bringing new ancillary industries into existence—this is one of the ways in which Hindustan Motors keep India's economy moving and growing.

Hindustan Motors Limited
Keeping India's economy moving and growing

CC/HM/1-1/74

অগ্রহায়ণ
তেরশ' একাশী

সমকালীন

দ্বাবিংশ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

শ্রীজীব গোস্বামী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

কল্পনা নয় বাস্তব, যিনি চতুর্বিংশতি অথবা পঞ্চম বিংশতি খ্রীষ্টাব্দে লিখবেন উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস তাঁকে অবশ্যই লিখতে হবে বাংলার সমাজ, বাংলার অর্থনীতি, বাংলার রাজনীতির সঙ্গে ইংরাজ জাতির কি সম্পর্ক ছিল, কি ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলার সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। ঠিক তেমনি দৃষ্টান্তেই লিখতে হয়—১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাহলুন লোদীর পাঠান রাজ্য স্থাপন, তারপর ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র সেকেন্দর শাহের দিল্লীর রাজসিংহাসন লাভ, তারপর ইব্রাহিমলোদীর রাজ্যকাল। এই সময়েই অথবা এরই সময়ে মথুরা বৃন্দাবনের গৌরব পতন এবং ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের দিল্লীর সিংহাসন লাভ।

অতএব ঐ দুটি শতকে বাংলায় কি ঘটেছিল জানতে গেলেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে জানতে হয়—১৪৮২-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জালালুদ্দিন ফতে শাহ, ১৪৮৬-৮৯ ফিরোজ শাহ, ইত্যাদি ক্রমে ১৫৩২-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন, তখন বাংলায় গিয়াসুদ্দিনের শাসনকাল। ওদিকে ১৪৯৭-১৫৪০ পর্যন্ত উড়িশায় চলছিল গজপতি বংশের প্রতাপরুদ্রের রাজ্যকাল।

পাশাপাশি দুটি রাজ্যের অধিবাসিরা তখন কিভাবে কাটিয়েছেন, তা ইতিহাসই বলে দেবে। আমরা সংক্ষেপে তা পড়ে বুঝি যে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার তথা বাঙ্গালীর হৃদয়ের রাজা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব হতেই দুটি রাজ্যে বিদ্রোহ, নরহত্যা, কপটতা ষড়যন্ত্র, ধর্মবিদ্বেষ ও অরাজকতা প্রভৃতি খুবই বেড়ে গিয়েছিল।

বাংলায় তখন হোসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী শ্রীসনাতন (সাকর মল্লিক), প্রাইভেট সেক্রেটারী দবিরখাস (শ্রীরূপ)। এদেরই ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত ছিলেন হাজিপুরের (বিহার) রাজকর্মচারী। আর

হোসেনের টাকশালের অধ্যক্ষ তখন অনুপম শ্রীবল্লভ (শ্রীজীবের পিতৃদেব)।

এদিকে হোসেনের গুরু চাঁদ কাজি তখন নবদ্বীপের শাসক, তিনিই নবদ্বীপে হরিকীর্তন নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন এবং বৈষ্ণবদের কীর্তনের মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্রগুলি ভগ্ন করার আদেশ দেন।

এই বাংলার এমনি দুর্যোগেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। ওড়িশা ও বাংলায় তেমনি দুর্দিনের মধ্যেই তিনি আটচল্লিশ বৎসর অতিবাহিত করে দুটি রাজ্যে যে কাজ করে গিয়েছেন তা ভারতীয় তথা বঙ্গীয় সংস্কৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে আছে। বৈদিকমানবতাবাদের পুনরুজ্জীবন এবং বিষ্ণু উপাসনায় বিশুদ্ধ ভক্তিবাদের অভিনব পদ্ধতি স্থাপন শ্রীগৌরাঙ্গের অমূল্য দান। এ দুটিকে রক্ষা করার জন্য যারা তাঁরই প্রেরণায় এগিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীরূপ, সনাতন ও তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ করেন ঐতিহাসিকবৃন্দ।

যদিও সমস্ত প্রেরণার মূল উৎস শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ, তথাপি সে উৎসকে সাহিত্যে ও দর্শনের দিক থেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্রীজীব। বাংলার বৈষ্ণবীয় মতবাদ কি? এ প্রশ্ন যখনই ওঠে, তখনই অভিধান খুলে শব্দার্থ জানার মত গ্রন্থ খুলে দেখা যায়, শ্রীজীবই ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবীয় 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' বাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যের রস পরিচিতির সার্বভৌম উৎস শ্রীরাধা গোবিন্দের উপাসনা প্রচারের ভিত্তি স্থাপক।

এই দুটি কার্যের জন্য শ্রীজীব তাঁর সমগ্র জীবনে ২৬ খানি গ্রন্থ নির্মাণ করেছেন। শ্রীজীব যে বাল্য কৈশোরে শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করেছিলেন মালদহের 'রামকেলিতে'। তেমন ইঙ্গিত দিয়েছেন 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থের লেখক নরহরি চক্রবর্তী (নামান্তর ঘনশ্যাম)।

চক্রবর্তী মহাশয়ের এই সঙ্কেতটি অসমীচীন নয়, কারণ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, সন্ন্যাস গ্রহণ ১৫০৯ এবং তিনি মালদহের রাম কেলিতে গমন করেন ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে, সেটা তাঁর সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে। এরই পর বৎসর তিনি বৃন্দাবনে যান, আর—১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগে শ্রীরূপের ও তাঁর কনিষ্ঠ-ভ্রাতা অনুপম বল্লভের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এরই কিছুদিন পরেই অনুপম যখন বৃন্দাবন যাত্রা করেন, পথে তাঁর লোকান্তর ঘটে। অতএব এঁরই একমাত্র পুত্র যখন শ্রীজীব, তখন অবশ্যই তার কিছুদিন আগেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই শ্রীজীবের জন্ম অব্দ কবে এ বিষয়ে ঐতিহাসিকবৃন্দ স্থির করেছেন শ্রীজীবের জন্ম ১৫১৭ থেকে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

শৈশবেই পিতৃহীন শ্রীজীব আত্মীয় বান্ধবদের তত্ত্বাবধানে থেকে বাল্য কৈশোরের শিক্ষা সমাপন করে কাশীতেই তাঁর অভীপ্সিত শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তখনকার অধ্যাপক মধুসূদন সরস্বতী। ইনি ছিলেন বাসুদেব সার্বভৌমের প্রিয়তম শিষ্য। যে বাসুদেবের জীবনে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ প্রভাব সর্বাধিক হওয়ায় অদ্বৈত বেদান্তের সংস্কৃতি অপেক্ষা ভক্তিবাদের মর্ম জ্ঞানীর পথই তাঁর অন্তিম জীবন পর্যন্ত অখণ্ড হয়েছিল। শ্রীজীব ছয় বৎসরের বেশী সময় কাশীতে বাস করে সাহিত্য, দর্শন এবং ন্যায়াদি শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

আচার্য শঙ্করের শারীর ভাষ্যের বিখ্যাত টীকাকার শ্রীমধুসূদন সরস্বতী (অদ্বৈতসিদ্ধি) তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধির দ্বারা অদ্বৈত বাদেরই সূক্ষ্মবিচার করে তাকে দার্শনিক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন এও যেমন ঐতিহাসিক সত্য, তেমনি 'ভক্তি রামায়ণ' গ্রন্থের দ্বারা নিজের বাকী জীবনকে জানিয়ে

গিয়েছেন ভক্তিবাদের পথই আমার কাম্য। তিনি এ বিষয়ে যত মন্তব্যই লিখে যান, তাদের মধ্যে দুটি শ্লোক চিরভাস্বর হয়ে আছে—

অদ্বৈত সাম্রাজ্য পথাধিরূঢ় তৃণীকৃতা খণ্ডল বৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপ বধূবিটেন॥

অর্থাৎ আমরা অদ্বৈত সাম্রাজ্যের পথে অধিরূঢ় হয়েও এবং ইন্দ্রের তুল্য বৈভবকে তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করলেও কোন এক গোপব ধূলপট শঠের দ্বারা বল পূর্বক দাসীকৃত হয়েছি।

এই মধুসূদনই শেষ জীবন তক ব্রত গ্রহণ করেছিলেন আমি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্যতত্ত্ব জানিনা, যে কৃষ্ণ নবীন নীরদকান্তি, যে কৃষ্ণ বংশীধর, যাঁর মুখ পূর্ণ চন্দ্রমার মত উজ্জ্বল, যাঁর দুটি নয়ন অরবিন্দ দলের মত।

বংশীবিভূষিত করাৎ নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণ-বিম্বফলধরোষ্ঠাৎ
পূর্ণেন্দুসুন্দর মুখাৎ অরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

এক্ষেত্রে কোন ঐতিহাসিকই নিরূপণ করতে পারেন নাই, যে, শ্রীজীব কৈশোরে ও যৌবনে শ্রীগৌরাঙ্গকে সাক্ষাৎভাবে দর্শনলাভ করতে পেরেছিলেন কিনা; কারণ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্ধান ঘটে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, আর শ্রীনিত্যানন্দের অন্তর্ধান ১৫৪২-১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। এদিকে শ্রীজীবের জন্মকাল ১৫১৭-১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে তা হলে শ্রীজীবের যৌবন কালের মধ্যেই দীর্ঘদিন শ্রীচৈতন্যের দেহাবস্থা যখন ঘটেছিল তখন উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

তবে বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাতি প্রামাণিক গ্রন্থের উক্তির দ্বারা জানা যায় নবদ্বীপে ধামে শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁরই আশীর্বাদ গ্রহণ এবং উপদেশ শ্রবণ করে শ্রীজীব আগমন করেন শ্রীবৃন্দাবনে।

শ্রীজীব মধ্যম জেঠামহাশয় শ্রীরূপের নিকট বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করেন আর, তাঁরও অগ্রজ বড় জেঠামহাশয় শ্রীসনাতনের নিকট কিছুদিন অবস্থান করে ভক্তিবাদের লীলা তত্ত্ববাদ অধিগত করেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপ তাঁকে ভক্তিতত্ত্ব ও ভক্তিবাদের দার্শনিক তত্ত্বগুলি শিক্ষা দান করেন।

ঐ উভয় গুরুর নিকট অবস্থানের সময়েই শ্রীজীবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রভাব যে প্রথম প্রথম ঠিক ঠিক বৈষ্ণব দীনতায় আসক্ত ছিল না এবং তারই জন্য শ্রীরূপ এবং শ্রীসনাতন একটু বিরক্তই হয়েছিলেন এমন কাহিনী মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যায়। সেই কাহিনীর ভিত্তি কিংবদন্তীমূলক হলেও বাংলার অনেক কবি ও গল্পলেখক শ্রীজীবের সঙ্গে দিগ্‌বিজয়ীর আলাপ এবং শ্রীরূপ সনাতনের সসৈন্য আত্মসমর্পণ ও শ্রীজীবের প্রতি ভর্ৎসনা ইত্যাদিকে জনগণের সমক্ষে একটি চিত্রকাব্যের বিষয় রূপে বর্ণনা করেছেন। উদ্দেশ্য তাঁদের, শ্রীগৌরাঙ্গের তৃণাদপি যাজনের মর্ম গ্রহণ শ্রীজীবের যৌবনে হয়নি।

এই কিংবদন্তীর পরও আর একটি কাহিনী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেকের মুখে মুখে ফেরে। তাঁরা বলেন, দিগ্‌বিজয়ীর সঙ্গে শ্রীজীবের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারে শ্রীরূপ শ্রীজীবকে শাসন করার জন্য বহুদিন যাবৎ তাঁর মুখদর্শন করেন নাই। শ্রীজীব তার জন্য মনোদুঃখে যমুনাপারে গোকুলে গিয়ে বাস করেন এবং ঐ খানেই ভক্তিশাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করতে থাকেন। এই সময় তিনি জীবন ধারণের জন্য শুধু 'আটা' চূর্ণ জলে গুলে আহার করতেন, তাঁর এইরূপ কৃচ্ছ্রতার জন্য 'উদরী' রোগ হয়। এইজন্যই

রাধাদামোদরে অঙ্গনের পাশে তাঁর সমাধিটি শায়িত পুরুষের। অন্য সবারই সমাধি উপবিষ্ট অবস্থায়। ঐ কারণেই নাকি একদিন শ্রীসনাতন তাঁর অনুজ শ্রীরূপকে বুঝিয়ে বলেন, শ্রীজীবের প্রতি ঐরূপ ভর্ৎসনা করাটা কঠোর হয়েছে, অচিরেই তুমি তাকে কাছে ডেকে নাও। অগ্রজের আদেশটিকে সম্মান জানিয়ে শ্রীরূপও শ্রীজীবকে সস্নেহে কাছে ডাকেন এবং লোকান্তরের অব্যবহিত কাল পর্যন্ত আর কাছছাড়া করেন নাই। নিজের রচিত গ্রন্থাবলীর বহু সিদ্ধান্ত তিনি শ্রীজীবের দ্বারা শোধন করিয়ে নেন।

শ্রীজীব কিন্তু এমন ঘটনার একটুকুও ইঙ্গিত দেন নাই আত্মজীবনীর শ্লোকগুলিতে। তিনি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা লঘুতোষনীর উপসংহারে (শ্রীভাগবতের টীকা) বলেছেন (সংস্কৃত ভাষায় রচিত)—

আমার উর্দ্ধতম সপ্তম পুরুষের নাম সর্বজ্ঞ। তিনি কর্ণদেশীয় ব্রাহ্মণগণের পূজনীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে তৎকালে লোকে 'জগৎ গুরু' বলেও খ্যাত করেছিলেন। তিনি ছিলেন উৎকৃষ্ট অধ্যাপক, বহু দেশ বিদেশের ছাত্ররা তাঁর নিকট বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধ। ইনিও পিতৃগুণ সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন এঁর ছিল দুটি পত্নী। একের গর্ভে রূপেশ্বর অপরের গর্ভে হরিহর। প্রথম পুত্র শান্তে, দ্বিতীয়পুত্র সময় বিদ্যায় অদ্বিতীয়। কনিষ্ঠ ভাইয়ের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে রূপেশ্বর দেশ ত্যাগ করে সস্ত্রীক চলে আসেন শিখর ভূমি। (বর্তমান নাম কি পঞ্চকোট ?) এরই পুত্র পদ্মনাভ। ইনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। পদ্মনাভ পরে বাস করলেন নবহট্ট গ্রামে (বর্তমান নৈহাটি) পদ্মনাভের আঠারটি কন্যা ও পাঁচটি পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম মুকুন্দ। তাঁর পুত্র কুমারদেব। ঐখানে ঐসময় ধর্মবিপ্লব হয় (হিন্দু মুসলমানের জাতি ধর্মের প্রাধান্য নিয়ে সংঘর্ষ) কুমারদেব চলে আসেন বাকলা চন্দ্রদ্বীপে (যশোহরে) কুমারদেবের অনেক পুত্রের মধ্যে তিনজনই প্রসিদ্ধ রূপ, সনাতন ও অনুপম। আমি অনুপমের পুত্র। এঁরা বাস করেছিলেন গৌড় রাজধানীর নিকটে সাকুর্মায়। আমি মাতুলালয়ে বাল্যশিক্ষা লাভ করি। আমার দুই জ্যেঠা মহাশয় গৌড়রাজ হোসেন শাহের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে রাজকার্য পরিচালন করেছেন। শ্রীসনাতনের ও শ্রীরূপের গ্রন্থবাণী রচনার সময় থেকেই শ্রীজীবও গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন।

শ্রীরূপ যে শ্রীভাগবতের একখানি টীকা রচনা করেছিলেন, যার নাম বৈষ্ণবতোষণী, তাকেই শ্রীজীব সংক্ষেপিত করে একটি টীকা রচনা করেন। গুরুদেবের টীকার নাম দেন বৃহৎতোষণী আর নিজেরটির নাম রাখেন লঘুতোষণী।

পণ্ডিতরা মনে করেন এই তাঁর প্রথম রচনা, আবার এমন নজিরও রয়েছে যে, শ্রীজীবের প্রথম জীবনের রচনায় কাব্যধর্মিতা ছিল বলেই 'মাধব মহোৎসব' কাব্যটিই তাঁর প্রথম।

শ্রীভাগবতের টীকাটিতে তিনি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করেন নি, সবই করেছেন শ্রীরূপের রচনার আনুগত্য। তাই ভাগবতে স্বাধীন চিন্তা ব্যক্ত করতে আর একটি পৃথক টীকা লেখেন, যার নাম দেন 'ক্রম সন্দর্ভ'।

সন্দর্ভ শব্দের ব্যবহার শ্রীজীবের খুব প্রিয় ছিল। সন্দর্ভ বললেই যাতে গূঢ়ার্থের প্রকাশ করা যায়, বক্তব্যকে সার এবং শ্রেষ্ঠ বলার জন্য সন্দর্ভ কথার সার্থকতা মানা যায় যাতে নানান দিক থেকে তাকে আলোচনা করা যায়, তাই শ্রীজীব তাঁর দার্শনিক মতবাদ স্থাপন করতে ওই 'সন্দর্ভ' নামই

ব্যবহার করেছেন। (১) তত্ত্বসন্দর্ভ (২) ভগবৎসন্দর্ভ (৩) পরমাত্মসন্দর্ভ (৪) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ (৫) ভক্তিসন্দর্ভ এবং (৬) প্রীতিসন্দর্ভ। (পূর্বেরটি ক্রমসন্দর্ভ টীকা)

এই সাতবার সন্দর্ভ শব্দের দ্বারা যে সাতখানি গ্রন্থ লিখেছেন, এক কথায় বলা যায় সবই শ্রীভাগবত গ্রন্থের বক্তব্যকে ভিত্তি করে অর্থাৎ ভাগবতেরই পরিপূর্তি করেছেন সাতটি দিকে। 'ক্রমসন্দর্ভ' করেছেন সামগ্রিকভাবে, আর ষট সন্দর্ভ করেছেন ছয়টি বিষয়কে কেন্দ্র করে।

তারপর সেই ছয়টি মধ্যে তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের বক্তব্যকে আরও সংক্ষেপিত করে, বক্তব্যগুলিকে একত্র গেঁথে রাখতে সুপ্রাচীন দার্শনিক ভাষায় তাকে লিপিবদ্ধ করে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তারই নাম দিয়েছেন 'সর্বসম্বাদিনী'

শ্রীজীবই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি শ্রীভাগবতের মতবাদকে পরিস্ফুট করার জন্য স্বাধীনভাবে যখন 'ক্রম-সন্দর্ভ' টীকা লেখেন, তখনই ঘোষণা করেছেন, শ্রীচৈতন্যের আনুগত্যে যাঁরাই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করবেন তাঁরাই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্তিত ধর্মীয় মতবাদকে সম্প্রদায়রূপে গ্রহণ করিবেন এবং সে সম্প্রদায়ের অধিদেবতা শ্রীগৌরাঙ্গকেই সর্বতোভাবে আশ্রয় করবেন। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন করে বলেছেন, 'স্বসম্প্রদায় সহস্রাধিদৈবং……'

আবার ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'গোপাল চম্পূ' নামে যে অসাধারণ চম্পূ কাব্য (গদ্যপদ্যময়) রচনা করেন তার মঙ্গলাবরণে শ্রীগৌরাঙ্গকে 'সর্ব শর্মদ কীর্তন্য…অর্থাৎ সর্বসুখপ্রদ ব্যক্তিগণের কীর্তনযোগ্য, সর্বপ্রকাশক এবং 'ভক্তাবতার তাদাত্ম্যপন্নতয়াবতীর্ণ' বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীজীব তাঁর প্রায় সমস্ত গ্রন্থের আদি এবং অন্তে শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণই যে এই গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাদৃশ ভাবময়ী ভক্তিবিস্তার করবার জন্যই আগমন করেছেন এটি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন।

কিন্তু কোথাও বলেন নাই রাই-কানু এক আত্মা দুই দেহ ধরেছিলেন, আবার একদেহ হয়ে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই যে ভক্তিবাদ-বিরোধী ব্রহ্মবৈবর্তবাদ এটি সপ্তদশ শতাব্দীতে গৌড়ের বৈষ্ণবধর্মে এসে প্রবেশ করেছে। এ মতবাদ যেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজই প্রবর্তন করেছেন, আসলে তাঁর নামে কোন সহজিয়াবাদীই একাজ করেছেন কারণ, বিবর্তনবাদ মানেই 'বস্তু নাই বস্তুর ভ্রম' এটি কখনও বৈষ্ণবের অভিপ্রেত হতেই পারে না। ব্রহ্মে বিবর্তন স্থাপন এতো মায়াবাদীদের সিদ্ধান্ত।

সেই জন্য শ্রীজীব পরিষ্কার করে বলেছেন তাঁর প্রখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ 'সর্বসম্বাদিনী'তে—শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধেয় শ্রীভগবানই কলিযুগে বৈষ্ণবগণের উপাস্য বলে নির্ণীত হয়েছেন।

এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করার জন্য শ্রীভাগবতের ১০।৮।২৩ শ্লোক 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য এবং ১১।৫।৫২ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং এই দুইটি শ্লোকের মনোরম ভাষ্য রচনা করেছেন।

তাছাড়া আরও তিনটি শ্লোক উদ্ধার করে সপ্রমাণ করে জানিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণই গৌরাঙ্গ।

শ্রীজীবের মত সূক্ষ্ম-চিন্তাশীল দার্শনিক, নৈয়ায়িক, সাহিত্যিক ব্যক্তির আবির্ভাব যদি না হত, তবে বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়টি দর্শনহীন এক সাহিত্য-প্রবণ বৈষ্ণবের দল বলেই আখ্যাত হয়ে যেত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বলদেব বিদ্যাভূষণ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় সেই বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক এবং সাহিত্যিক মতবাদকে ওলোট-পালট করে গিয়েছেন। যেটি আজ শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে সহজগ্রাহ্য

হয়ে আছে। অর্থাৎ শ্রীজীব বলেছেন—শ্রীগৌরাঙ্গের মতবাদ একটি স্বতন্ত্র মতবাদ এবং তা শ্রীরামানুজ প্রভৃতির চিন্তাধারাকে মান্য করেই অগ্রসর হয়েছে। আর শ্রীগৌরাঙ্গের রসবাদ স্বকীয় রতির ধারারই উজ্জীবক।

আর বলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর প্রবর্তনায় এটি অন্য রূপ নিয়েছে অর্থাৎ বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় 'মাধবাচার্য' সম্প্রদায়ের অনুগত হয়েও রসবাদিতায় সেটি পরকীয়ারতির উদ্দীপক।

বর্তমান বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শেষোক্ত চিন্তাধারাই অনুবর্তন চলে। শ্রীজীব তাঁদের কাছ থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছেন। শ্রীজীবের চিন্তাধারায় সহজিয়া মতবাদের পোষকতা কিছুমাত্র নাই।

শ্রীজীবের বাকী নয়খানি গ্রন্থ ছাড়া অর্থাৎ ছটি সন্দর্ভ, দুখানি ভগবত টীকা এবং সর্বসম্বাদিনী ছাড়া আরও যে কয়খানি গ্রন্থ নির্মাণ করেছেন তা হল ব্যাকরণ শাখায় হরিণামামৃত ব্যাকরণ, সূত্রমালিকা এবং ধাতুসংগ্রহ।

অলঙ্কার শাখায়—ভক্তিরসামৃত শেষ।

কাব্যশাখায়—মাধব মহোৎসব মহাকাব্য গোপাল চম্পূ (পূর্ব ও উত্তর ভাগ), সংকল্প কল্পবৃক্ষ, গোপাল বিরুদাবলী।

টীকা ও ব্যাখ্যা শাখায়—গোপাল তাপনী।

ব্রহ্মসংহিতা, ভক্তিরসামৃত, উজ্জ্বল নীল মণি, যোগসার স্তব, গায়ত্রীভাষ্য।

প্রকরণ শাখায়—রাধাকৃষ্ণার্চন দীপিকা, শ্রীকৃষ্ণ পদচিহ্ন সমাহার, শ্রীরাধিকা করণপদচিহ্নসমাহৃতি।

শ্রীজীবের সমগ্র গ্রন্থাবলীর প্রতিটি বিভাগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেও সেটি হবে একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। যদি সে সুযোগ আসে কখনও তবে তা অবশ্যই করব।

এ প্রবন্ধের সমাপ্তি টানার শেষ কথা হল, শ্রীজীবের জন্ম খ্রীষ্টীয় ১৫১৭-১৫১৮ এবং লোকান্তর ১৫৮২-১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দেই সুনিশ্চিত। বাংলার অভিনব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এই একটি মাত্র পুরুষের দ্বারা শুধু বাঙ্গালীজাতিরই নয় সমগ্র ভারতীয় জাতিরই মর্যাদা বেড়েছে বিশ্বমানবের মনীষিতার আসনে।

অগ্নিপুরাণে নাট্যচিন্তা

কৃষ্ণজীবন ভট্টাচার্য

অগ্নিপুরাণের মধ্যে যে বিচিত্র বিষয়ের সংকলন আমরা দেখতে পাই তা খুবই সংক্ষিপ্ত আকারের হলেও গুপ্তোত্তর যুগের শিল্পবিজ্ঞান, সমাজ ও সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে এই পুরাণটি একটি সর্বাতিশায়ী পরিচয় বহন করে। সংকলন গ্রন্থ হিসেবে অগ্নিপুরাণ অন্যান্য পুরাণগুলির তুলনীয় একটু স্বতন্ত্র চরিত্রের। পুরাণের পঞ্চলক্ষণের কড়া শাসনটি এখানে শিথিল। সূত্রের অতিপরিমিতির মধ্যে বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়গুলির নির্যাসকে সংকলিত করে একটি আভিধানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। এই আভিধানিক রূপটি আরও চোখে পড়ে যখন দেখা যায় যে জীবন ও মননের বিশেষ করে শিল্প ও সংস্কৃতির প্রায় সব শাখারই অর্জিত অভিজ্ঞতার স্বল্প পরিসর পরিচয় এই একটি পুরাণের মধ্যেই বিধৃত হয়েছে। কিন্তু এই অতি সংক্ষিপ্ত সার সংকলনের প্রচেষ্টাটির মধ্যেই রয়েছে অবক্ষয়ের ছায়াপাত, অবলুপ্তির আশঙ্কা। এ ছাড়াও, রয়েছে খুটিনাটি বিচারে প্রায় প্রতিটি বিষয়েই মাঝে মাঝে অসঙ্গতি, অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ অবতারণা চোখে পড়ে। এই লক্ষণগুলি যে বিকামমান কোন কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক চেতনার ফলশ্রুতি নয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বরঞ্চ ক্ষয়িষ্ণু গুপ্তোত্তর কালের স্তিমিত প্রতিভা ও সংকোচনের যুগেরই লক্ষণ বলেই প্রতিভাত হয়। প্রাচীনতর সংকলন গ্রন্থগুলির বা আচার্যগণের উপস্থাপিত তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে অগ্নিপুরাণে সংকলিত বিষয়গুলির মিল ও অমিল তুলনা করে গবেষকরা অগ্নিপুরাণের রচনাকাল স্থির করেছেন খ্রীষ্টাব্দ ৭০০ থেকে খ্রীষ্টাব্দ ১০০০ অবধি। বিশেষকরে অগ্নিপুরাণে বর্ণিত তন্ত্রাচারি কর্মকাণ্ডটিও ঐ কালব্যাপ্তিকেই সমর্থন করে। গূঢ় প্রতিটি বীজমন্ত্রগুলি সহ প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের দেবদেবীর সমাবেশ ও লৌকিক ব্রত ও ধ্যানধারণার চিত্রটি দেখে মনে হয় এই পুরাণটি অষ্টমশতাব্দীর পরেই সংকলিত। এবং এই সঙ্গে বলা যায় যে এই পুরাণটি সময়ান্তরে বিস্তৃত পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের সাক্ষ্য দেয়।

সে যাই হোক, সাহিত্য চিন্তার ক্ষেত্রেও যে সকল গ্রন্থ ও পূর্বাচার্যগণের প্রভাব অগ্নিপুরাণে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তারমধ্যে দ্বিতীয় তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও পিঙ্গলের ছন্দসূত্র, খ্রীঃ অঃ ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর দন্ডীর কাব্যাদর্শ ও ভামহের কাব্যালঙ্কার, খ্রীঃ অঃ দশম শতাব্দীর ধনঞ্জয়ের 'দশরূপক' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিল্প সংস্কৃতির অন্যান্য নানা বিষয়ের মতই নাট্যচিন্তার ক্ষেত্রে যে স্বল্প পরিচিতির সাক্ষ্য এখানে রয়েছে তার মূল্য কম নয়। নাট্যতত্ত্ব ও তার কলাকৌশলের বিভিন্ন দিক ও প্রসঙ্গ এখানে সূত্রাকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে রয়ে গেছে। প্রাচীনতম গ্রন্থ হিসাবে ও বিস্তৃত পরিচয় লাভের জন্য যেমন ভরতের নাট্যশাস্ত্র একদিকে রয়েছে তেমনি অর্বাচীন কালের সাহিত্যদর্পণকার প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষতম বিবর্তনটি বহন করে আর এক প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। মাঝখানে রয়েছে অগ্নিপুরাণ, আদি মধ্যযুগের অতীন্দ্রিয়বাদ, সংকোচন, বিচ্ছিন্নতা, রাজনৈতিক অস্থিরতার বিভ্রান্তি ও আবরণকে উপেক্ষা করে সে যুগের চলমান জীবনের কিছুটা পরিচিতির আলোক বহন করছে অগ্নিপুরাণ।

অগ্নিপুরাণের তিনশত আটত্রিশ অধ্যায়টি নাটক নিরূপণ নামে অভিহিত। এটিও অগ্নিপুরাণের অলঙ্কারশাস্ত্র বিষয়ক যে এগারোটি অধ্যায় আছে তারই অন্তর্গত। তিনশত সাঁইত্রিশ থেকে তিনশত সাতচল্লিশ অধ্যায়ে এই কাব্য ও নাটকাদির অলঙ্কার বর্ণিত হয়েছে। তিনশত সাঁইত্রিশ অধ্যায়ের প্রথমেই বলা হয়েছে :

কাব্যস্য নাটকাদেশ্চ অলঙ্কারান বদাম্যথ।
ধ্বনির্বর্ণাঃ বাক্যমিত্যেতাস্ত্রয়ঃ মতম ॥
শাস্ত্রেতিহাস বাক্যানাং ত্রয়ী যত্র সমাপ্যতে।

অগ্নি বলিলেন—অতঃপর আমি তোমাকে কাব্য ও নাটকাদির অলঙ্কার সকল বলিতেছি। ধ্বনি, বর্ণ, পদ, বাক্য এই সকল নাম বাঙ্ময়। শাস্ত্র, ইতিহাস ও বাক্য এই তিনটি ঐ বাঙ্ময়ে সমাপিত হয়। এবং এই অধ্যায়ের শেষে বলা হয়েছে :

মিশ্রং বপুরিতি খ্যাতং প্রকীর্ণমিতি চ দ্বিধা।
শ্রব্যধেবাভিনেয়ক প্রকীর্ণং সকলোক্তিভিঃ ॥

ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি থাকিলে মিশ্র নামে খ্যাত হয়; ইহাই প্রকীর্ণ। প্রকীর্ণ দুই প্রকার; শ্রাব্য ও অভিনেয়। সকলোক্তি দ্বারা প্রকীর্ণ হয়।

প্রকীর্ণ নামক রচনা তাহলে দুপ্রকার শ্রাব্য ও অভিনেয়। এই অভিনেয়কে পরের অধ্যায়ে রূপক বলা হয়েছে। যেখানে কল্পিত অথবা ইতিহাস পুরাণাদি বর্ণিত চরিত্রের রূপ আরোপিত হয় তাহাই রূপক। নাট্যতত্ত্বের এই রূপকই আধুনিক পরিভাষায় নাটক। তাহলে অভিনেয় প্রকীর্ণও একধরণের রূপক। প্রক্ষিপ্ত বা অবিন্যস্ত ক্ষুদ্রকায় নাটকগুলিকেই প্রকীর্ণ নাম দেওয়া হয়েছিল। নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম বহির্ভূত অনিয়মিত লৌকিক নাটক হতে পারে। তিনশত আটত্রিশ অধ্যায়ে কিন্তু নাটকের বিশেষ চরিত্র ও প্রকৃতি ও শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। বিভিন্নধরণের নাটকের প্রকারভেদের উল্লেখও আছে।

এখানে দেখা যায় অভিনেয়ের রূপক অর্থে নাটক সাতাশ প্রকার। যেমন, নাটক, প্রকরণ, ডিম, সমবকার, ঈহামৃতা, প্রহসন, ব্যায়োগ, ভাণ, বীথি, অঙ্ক, ত্রোটক, নাটিকা, সট্টক, শিল্পক, দুর্মল্লিকা, প্রস্থান, ভাণিকা, ভানী, গোষ্ঠি, হল্লীশক, কাব্য, শ্রীগদিত, নাট্যরাসক, উল্লাসক বা রাসক, উল্লাপ্যক, কর্ণালাপ, প্রেঙ্খণ। প্রকারভেদে রূপকের যে সাতাশটি পৃথক নাম পাওয়া গেল তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অগ্নিপুরাণ একেবারেই নীরব। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে কিন্তু দশরূপকের কথা উল্লেখ আছে। অন্যদিকে বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণে দশরূপক ও অষ্টাদশ উপরূপকের সূচী ও তাদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত রূপকগুলি হল, নাটক, প্রকরণ, ডিম, ঈহামৃগ, সমবকার, প্রহসন, ব্যায়োগ, ভাণ, বীতি ও অঙ্ক। সাহিত্যদর্পণের রূপক ও উপরূপকের সূচী থেকে অগ্নিপুরাণের মোট চব্বিশটি রূপকের নাম মিল পাওয়া যায়। কেবল অগ্নিপুরাণের বর্ণালাপ, ভাণ, উল্লাসকের বদলে রাসক, সংলাপক, বিলাসিকা ও প্রকরণিকার উল্লেখ আছে। সেদিক থেকে সাহিত্যদর্পণকার অগ্নিপুরাণকেও তথ্যের অন্যতম উৎস হিসাবে ব্যবহার করেছে। সাহিত্যদর্পণে নাট্যতত্ত্বের আলোচনায় অগ্নিপুরাণের উল্লেখও আছে।

এরপরই বলা হয়েছে যে নাটকে সামান্য ও বিশেষ লক্ষণের দুপ্রকার গতি আছে (সামান্যঞ্চ বিশেষশ্চ লক্ষণস্য দ্বয়ী গতিঃ)। এই গতি কি নাটকের movements—প্লটের অগ্রগতি না এই গতি শব্দটি লক্ষণ অর্থেই ব্যবহৃত। যাই হোক, সামান্য গতি নাটকের সাধারণ ধর্ম, আর সমস্ত প্রকার নাটকেই এই লক্ষণটি থাকবে। সামান্য লক্ষণের গতি নাটকের আঙ্গিক অর্থকর্ম, বাচনভঙ্গি, ভাব, রস সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করে। পুরাণে বলা আছে : রসভাববিভাবানুভাবা অভিনয়স্তথা।

অঙ্কস্থিতিশ্চ সামান্যং সর্বত্রৈবোপসর্পনাৎ ॥ রস, ভাব, বিভাব, অনুভাব, অভিনয়, অঙ্ক এবং এবং স্থিতি এই সর্ববিষয়েই সামন্যগতি অবস্থান করে। অঙ্ক কথাটি কি এখানে অঙ্কবিভাজন অর্থে না অঙ্কমধ্যস্থিত বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবহৃত? আর 'স্থিতি' কি নাটকের মূল সুরটির অবিচ্ছিন্ন অব্যাহত থাকার কথা ঘোষণা করছে। অথবা স্থিতি অর্থে প্রারম্ভ ও পরিণতির মধ্যে একটি ঐক্যের কথা ঘোষণা করছে। অঙ্কস্থিতি একথাও হতে পারে সে অর্থে। অন্যদিকে বিশেষ গতি বা লক্ষণটির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে এটি সামান্য গতির মত সর্বব্যাপক নয় বরঞ্চ বিশেষ প্রয়োজনে কখন ব্যতিক্রম হিসাবেও দেখা দিতে পারে। ভারতের নাট্যশাস্ত্রেও নাটকের দুটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে : আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক। আধিকারিক হল প্রধান বা সাধারণ লক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক অর্থে নাটকের বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য হেতু বিশেষ লক্ষণটিকে ধরা হয়েছে। কিন্তু গতি বা প্লটের movement এর কথা নাট্যশাস্ত্রে কিংবা অন্য কোন প্রাচীন ভারতীয় নাট্যতত্ত্বের নিবন্ধে উল্লেখ নেই। আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক নামক নাট্যলক্ষণ দুটি নাটকের বিষয়বস্তু বা ঘটনার প্রকৃতিকে লক্ষ্য রেখেই বলা হয়েছে। সেখানে নাটকের ক্রম অগ্রগতি ও সার্বিক চরিত্রটি অনুপস্থিত।

পুরাণকারের মতে নাটকের বিষয়বস্তু বা ইতিবৃত্তও দুভাগে বিভক্ত। প্রাচীন উপাখ্যান বা ইতিহাস থেকে সংগৃহীত পৌরাণিক বিষয়গুলি আগম বা সিদ্ধ বিষয়বস্তু আর কবিসৃষ্ট বা কল্পিত বিষয়কে উৎপ্রেক্ষিত বলা হয়েছে।

॥ পূর্বরঙ্গ বা নাট্যারম্ভের আদি কর্তব্য ॥

অগ্নিপুরাণে নাট্যানুষ্ঠানের প্রারম্ভে পূর্বরঙ্গ নামক অনুষ্ঠানটির বত্রিশটি অঙ্গ বা অংশের কথা বলা হয়েছে। এটি নাটকেরই অংশ। নাটকের সঙ্গেই নাট্যকার গ্রন্থনা করেছেন পূর্বরঙ্গ। এই পূর্বরঙ্গের অনুষ্ঠানটির মধ্যে হয়ত প্রাচীন কৌমের যাদুশক্তির ব্যবহারটি প্রথায় সিদ্ধ হয়ে সংস্কৃত ও পরিশীলিত রূপ নিয়ে টিকে ছিল। কেন না নাট্যানুষ্ঠানের প্রারম্ভে সকল প্রকার বিঘ্ন ও অমঙ্গল নাশের জন্যই যে এই অনুষ্ঠান তাতে আর কি সন্দেহ। যাই হোক, পূর্বরঙ্গের বত্রিশটি অঙ্গের মধ্যে নান্দী ও মুখ এর কথাই শুধু উল্লেখ আছে। নাট্যশাস্ত্রে কিন্তু পূর্বরঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের রচনাকালে পূর্বরঙ্গের বিস্তৃত ব্যবহার ও বিচিত্র প্রয়োগ রীতিটি পরবর্তীকালে ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়ে ওঠে। এখানে দেবতা ও গুরুর স্তুতি, নৃপাদির আশীর্বাণীর উপস্থাপন শেষ করে সূত্রধার গুরু পরম্পরা সংযুক্ত কবি বা নাট্যকারের বংশ প্রশংসা, কবির নিজ পৌরুষ কীর্তন এবং কাব্যের সম্বন্ধ ও অর্থ নির্দেশের কথা বলা হয়েছে। এর পরেই যখন সূত্রধার-ভার্যা নটী, বিদূষক অথবা পরিচারকবৃন্দরা মিলিতভাবে সূত্রধারের সঙ্গে নাটকের প্রস্তুতিজ্ঞাপক মনোহর বাক্যসমূহ দ্বারা সংলাপ শুরু করে তখনই আমুখ বা প্রস্তাবনা শুরু হয়। নাটকের এই প্রস্তাবনাটির উদ্ভব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এই পর্বের পাত্রপাত্রীদের

ব্যবহার স্বকার্যোথিত হওয়া চাই। পাত্রপাত্রীদের সংলাপ, আচরণ ও নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে একটি সংগতি, স্বাভাবিকত্ব ও সুসামঞ্জস্য আনয়নের কথাই এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবনাও তিনটি পরিস্থিতিতে বিভক্ত। প্রবৃত্তক, কথোদ্‌ঘাত ও প্রয়োগাতিশয়। যাহাতে সূত্রধর তৎকালীন কোন বিষয় অবলম্বনে বর্ণনা করে এবং নাটকের কোন পাত্রের সেই কালাশ্রয়ী প্রবেশকে প্রবৃত্তক বলে। যাহাতে সূত্রধারের বাক্য ও বাক্যার্থ গ্রহণ করিয়া পাত্র প্রবেশ করে, তাহার নাম কথোদ্‌ঘাত, যাহাতে সূত্রধার প্রয়োগসমূহের প্রয়োগ বর্ণনা করে এবং তদনুসারে পাত্র প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে প্রয়োগাতিশয় বলে। প্রয়োগসমূহ বলতে রঙ্গমঞ্চ মধ্যে বিষয়বস্তু বা প্লট ও ভাব ও কম যোজনার বিশেষ প্রযুক্তিটির কথাই মনে হয় এখানে বলা হয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে প্রস্তাবনা পাঁচ প্রকার। অগ্নিপুরাণের তিনটি ভেদ ছাড়াও আরও দুটির উল্লেখ আছে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে।

॥ পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি (পঞ্চ চেষ্টা) ও পঞ্চসন্ধি ॥

নাটকে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৌশল ও প্রশ্নগুলিকে ক্রম অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে ও নাটকে রসসৃষ্টির প্রয়োজনবোধে নাটকে পাঁচটি পদার্থ বা উপাদানের কথা অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে। এগুলিকে পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি বা পঞ্চ চেষ্টা নাম দেওয়া হয়েছে। যথা, বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী এবং কার্য। এর মধ্যে মাত্র বীজ সম্পর্কেই অগ্নিপুরাণে বলা আছে যে অল্পমাত্র উদ্ভিন্ন হইয়া যাহা ফলে অবসান পায়, তাহাকে বীজ বলে। এই বীজই নাটকের প্রাথমিক সত্ত্বা বা প্রকৃতিকে গড়ে তোলে। নাটকের key note। বীজ থেকেই নাটকের ক্রম প্রসারণ শুরু হয়। প্রস্তাবনার কলাকৌশলটিও এই বীজের অন্তর্গত। তেমনি আবার অর্থ ও রস যোজনায় বীজের অবয়ব বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ নাটক পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। এই পর্বও প্রকৃতি পঞ্চ চেষ্টা নামেও অভিহিত। প্রারম্ভ, প্রযত্ন প্রাপ্তি, সম্ভাব ও নিয়মিত ফলপ্রাপ্তি। এগুলিকে ফলযোগও বলা হয়েছে। আসলে এখানে নাটকের ক্রম অবস্থানের দিকটিই ধরা হয়েছে। অন্যদিকে নাটকের ক্রম পর্যায় যে মানসিক প্রতিক্রিয়াটি গড়ে ওঠে তারই বিভিন্ন অবস্থান অনুসারে নাটকের গঠনকে পাঁচটি ভেদে ভাগ করা হয়েছে। যথা—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও নির্বাহণ। এগুলিকে পঞ্চসন্ধি বলা হয়েছে।

নাটকে দেশ ও কালের ঐক্যটি আগেই বলা হয়েছে যে অলঙ্কার বিষয়ক এগারোটি অধ্যায়ে কাব্য ও নাটকাদির বিভিন্ন অলঙ্কার বর্ণিত আছে। তিনশত আটত্রিশ অধ্যায়টি শুধু নাটক নিরূপণ অধ্যায় নামে খ্যাত। কিন্তু তিনশত উনচল্লিশ অধ্যায়ে শৃঙ্গারাদি রস নিরূপণ ও নায়ক নায়িকাভেদ দেখানো হয়েছে। ঐ অধ্যায়ে কাব্যাদিতে ভাব ও রস যোজনা প্রসঙ্গে যেটুকু নাটকের সঙ্গে যুক্ত তা উদ্ধার করা হল : অগ্নিপুরাণ বলছেন :

'কাব্যাদিতে ভাব ও রস যোজন করা কবিদিগের কর্তব্য। যাহাতে রত্যাদি বিভাবিত হয় এবং যৎকর্তৃক বিভাবিত হয়, তাহার নাম বিভাব ; বিভাব অবলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে দুই প্রকার। যাহাকে অবলম্বন করিয়া রত্যাদি হয়, তাহাকে আলম্বন বিভাব কহে ও উহা নায়কাদি হইতে উৎপন্ন হয়। এবং যৎকর্তৃক রত্যাদির উদ্দীপন হয়, তাহাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত এই চতুর্বিধ কাব্যাদির নায়ক। অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট এই চারিপ্রকার নায়কও প্রবর্তিত হয়।' এ ছাড়াও 'পীঠমর্দ, বিট ও বিদূষক ইহারে শৃঙ্গারে নর্মসচিব এবং নায়কের

অনুনায়ক। পীঠমর্দ নায়ক সম্বলক নামে খ্যাত এবং কুপিত স্ত্রীপ্রসাদক। তদ্বগগ শ্রীমান বিট কামুক নায়কের অনুচর। বৈহসিককে বিদূষক বলে।' এর পরেই আবার অগ্নিপুরাণ বলছেন : নায়িকা অষ্টপ্রকার ; স্বকীয়া, পরকীয়া, পুনর্ভূ, কৌশিকা, সামান্যা ইত্যাদি। এখানে মাত্র পাঁচ প্রকার নায়িকার উল্লেখ করা হল। স্ত্রৈণ ও পৌরুষ ভেদেও নায়ক স্থির করা হয়েছে। 'শোভা, বিলাস, মাধুর্য, স্থৈর্য, গাম্ভীর্য লালিত্য, ঔদার্য ও তেজ এই অষ্টপ্রকার পৌরুষ দেখা যায়। আবার স্ত্রীদিগের বিভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে হাব, ভাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, শৌর্য, প্রগলভ, উদারতা, স্থৈর্য ও গাম্ভীর্য এই দ্বাদশ প্রকার বিভাব।'

॥ বাগারম্ভ ॥

নানাধরণের বাগবিন্যাস ও বাগকৌশলের কথাও অগ্নিপুরাণে বলা আছে। বলা হয়েছে আভাষণই আলাপ, বহুকর রচনাই প্রলাপ, দুঃখবান বিলাপ, বারংবার বচনোক্তিই অনুলাপ, উক্তি প্রত্যুক্তিই সংলাপ, অন্যথা বাক্ অপলাপ, বাক্যের প্রয়াণই সন্দেশ, প্রতিপাদনই নির্দেশ। এছাড়া তত্ত্বদেশ, অতিদেশ ও অপদেশ এর উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে শিক্ষাবাক উপদেশ, ব্যজোক্তিই ব্যপদেশ। এইভাবে নাটকীয় বাগবিন্যাসের অতিসূক্ষ্ম শ্রেণীভেদ করা হয়েছে।

॥ রীতিনিরূপণ ॥

রীতিনিরূপণ অধ্যায়ে চার প্রকার রীতির কথা উল্লেখ আছে। বাগবিন্যার ক্ষেত্রে পাঞ্চালী, গৌড়ী, বৈদর্ভী ও লাটি এই চার প্রকার রীতি সুপ্রসিদ্ধ। তার মধ্যে গৌড়ীরীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সকল সন্দর্ভ অনবস্থিত ও দীর্ঘ বিগ্রহাবিশিষ্ট পদ আশ্রয় করে গড়ে ওঠে তা গৌড়ী (গৌড়দেশীয়) রীতি নামে চিহ্নিত হয়। এই রীতিগুলিকে মূলতঃ বিগ্রহপদের স্বল্পতা কিংবা দৈর্ঘ্যের দিক থেকে বিচার করা হয়েছে। অলঙ্কার শাস্ত্রের দোষ বা গুণ এর সঙ্গে রীতিগুলিকে কিন্তু যুক্ত করা হয় নি। দণ্ডী কিংবা বামন বিশেষ দোষ ও গুণের উল্লেখ করেই রীতি নির্ধারণ করেছেন। এই রীতিগুলি নাটকীয় বাক উপস্থাপনাকেই মূলতঃ চিহ্নিত করে।

সেই সঙ্গে রীতিবৃত্তি নামক চার প্রকার নাট্যক্রিয়ার কথাও অগ্নিপুরাণে বলা আছে। অগ্নিপুরাণের মতে : 'যাহা ক্রিয়াসমূহে অবিষমরূপে বিদ্যমান তাহাকে রীতিবৃত্তি কহে। এই বৃত্তি চারি প্রকার ; ভারতী, আরভটী, কৌশিকী ও সাত্বতী।' তার মধ্যে মাত্র ভারতী ও আরভটীর ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া যায়। 'বাক প্রধানা, নরপ্রায়া, স্ত্রীযুক্তা ও প্রাকৃতোক্তি বিশিষ্টা রীতিই ভারতী। ভরত ইহার প্রণেতা বলিয়া ভারতী এই নাম হইয়াছে। এই ভারতী রীতির ব্যবহার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে পরিহাসময় প্রহসন, বীথি সহ নাটকের প্রস্তাবনা অংশটি ভারতী রীতির মধ্যেই পড়ে। বীথি একধরণের রূপক হলেও তার একটি বিশেষ চরিত্র আছে। যেখানেই উদ্ঘাতক, লপিত, অসৎপ্রলাপ, ছেদহীন বাকশ্রেণী, নালিকা, বিপণ, ব্যবহার, ত্রিমত, ছলনা, অবস্কন্দ, গণ্ড, মৃদু ও অচিত এর ব্যবহার থাকবে সেখানেই ভারতী রীতির প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু অগ্নিপুরাণে রীতিবৃত্তির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

॥ অভিনয় ও অঙ্গকর্ম ॥

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশেষ ভঙ্গিমা ও ক্রিয়াছাড়া অভিনয়ের রূপ আরোপিত হয় না এককথায়

নাটক ও নাটকীয় হয়ে ওঠে না। শুধুমাত্র বাক্যযোজনাই যে অভিনয় নয়, ভাব বলেই রস, রীতি প্রভৃতি অলঙ্কার শাস্ত্রের মধ্যেই নৃত্যাদি অঙ্গকর্ম নিরূপণ নামক অধ্যায়টিও যুক্ত হয়েছে। তিনশত বিয়াল্লিশ অধ্যায়ের প্রথমেই তাই বলা হয়েছে :

আভিমুখ্যং নয়ন্নর্থান বিজ্ঞেয়োঽভিনয়ো বুধৈঃ।
চতুর্দ্ধাসম্ভবঃ সত্ত্বরাগঙ্গাহরণাশ্রয়ঃ ॥
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকো বাগারম্ভো বাচিক আঙ্গিকঃ।
শরীরারম্ভ আহার্য বুদ্ধ্যারম্ভপ্রবৃত্তয়ঃ ॥

'বুধগণ বলিয়া থাকেন যে অভিমুখে পদার্থ আনয়নই অভিনয়। সেই অভিনয় সত্ত্ব, বাক্য, অঙ্গ ও আহরণাশ্রয়ে চারি প্রকার। স্তম্ভাদিকে সাত্ত্বিক, বাগারম্ভকে আঙ্গিক ও বুদ্ধির আরম্ভ ও প্রবৃত্তিকে আহার্য কহে।'

এখানে অভিনয়ের চার উপাদানের কথা বলা হয়েছে। এই চারটি উপাদানের সঠিক ও মিলিত ব্যবহারই নাটকের অভিনয়ের জন্য প্রয়োজন। এবং এই উপাদানগুলির সুসমঞ্জস সমাবেশ ঘটিলেই নাট্যকারের বক্তব্য বিষয়বস্তু আকাঙ্খিত ভাব ও রসে সঞ্চারিত হয়ে ওঠে ও দর্শক শ্রোতার কাছে তা হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। এখানে সত্ত্ব বলতে ব্যভিচারীভাব সহ স্তম্ভ প্রভৃতি অষ্টবিধ সাত্ত্বিকভাবের কথাই বোঝায়। চরিত্ররূপায়নের ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিস্থিতির ভিন্নতা হেতু মানসিক অবস্থার যে পরিবর্তন হয় তারই কথা এখানে বলা হয়েছে। সুতরাং সত্ত্ব মানসিক প্রক্রিয়ারই নামান্তর। বাক হল স্বর নিক্ষেপ সহ বাচনভঙ্গিমা। আর আঙ্গিক হল চেষ্টা বিশেষে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া ও অবস্থান। আবার বুদ্ধির শৃঙ্খলা ও ভেদাভেদ জ্ঞানপ্রসূত প্রযত্নটিরও প্রয়োজন অভিনয়ের ক্ষেত্রে। এই বুদ্ধিই নাটকের সকল বিষয়কেই ভাব, অঙ্গকর্ম ও বাচিক ক্রিয়াকে একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে। এক কথায় অভিনয়ের সকল বিষয়কেই একটি সুসমঞ্জস শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে এসে অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়াকেই আহরণ বলা হয়েছে।

সে যাই হোক এই চারটি উপাদানের মধ্যে অর্থাৎ কর্মের জন্য একটি পৃথক অধ্যায় আছে। নৃত্যের সঙ্গে এই অঙ্গকর্ম মূলত যুক্ত হলেও অভিনয়েও তা প্রযোজ্য। নৃত্যে ও নাটকের মধ্যে যোগসূত্রেও অতি নিকট। তাছাড়া নৃত্যও নাটকের অংশ। মূলতঃ ছন্দের গূঢ় তাৎপর্যটি ভারতীয় শিল্পের প্রাণ। যেমন অভিনয়ের ক্ষেত্রে নৃত্যশাস্ত্রের জ্ঞান থাকা দরকার তেমনি চিত্রকলার অনুশীলন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রেও যে নৃত্যশাস্ত্রের বিশেষ করে অঙ্গকর্মের সঠিক পরিচিতির প্রয়োজন প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণ তা বলে গেছেন। তাই বিষ্ণুধর্মোত্তর নামক উপপুরাণে বলা হয়েছে :

বিনা তু নৃত্যশাস্ত্রেণ চিত্রসূত্রং সুদুর্বিদম্
জগতোছন্যক্রিয়া কার্যা দ্বয়োরপি যতো নৃপ ॥

অগ্নিপুরাণ বলেছেন—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এই উভয়ের চেষ্টা বিশেষই অঙ্গকর্ম। এবং উহা কোথাও মুখ্যরূপে, কোথাও বা বক্ররূপে সাধিত হয়। আর লীলা, বিলাস, বিদিক্তি, বিভ্রম, কিল কিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত, বিকৃত, ক্রীড়িত ও কেলি এই দ্বাদশপ্রকার অঙ্গকর্ম। এগুলির মধ্যে মাত্র চারপ্রকার। অঙ্গকর্মের প্রাথমিক ব্যাখ্যা পুরাণে পাওয়া যায়। যেমন, ইষ্টজনের চেষ্টার অনুকরণের

নাম লীলা, কিঞ্চিৎ বিশেষ প্রদর্শনের নাম বিলাস। হাস্য ও রোদনের সম্মিলনকে কিলকিঞ্চিত কহে। কোনও রূপ বিকারই বিব্বোক। সুকুমার ভাবই ললিত।

শির, হস্ত, বক্ষস্থল, পার্শ্ব, কটি ও পদ ইত্যাদি অঙ্গ, আর ভ্রূলতাদি প্রত্যঙ্গ। ইহাদের মধ্যে শিরের ত্রয়োদশ প্রকার অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে; যেমন, আকম্পিত, কম্পিত, ধূত, বিধূত, পরিবাহিত, আধূত, অবধূত, আচিত, নিকুঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোগত ও ললিত। রসস্থায়িণী, সঞ্চারিণী ও প্রতিবন্ধনীভেদে দৃষ্টি তিন প্রকার। ষড়বিধা নাসিকা, নিশ্বাস নয় প্রকার। ওষ্ঠকর্ম ছয় চিবুকক্রিয়া সপ্তবিধা, গ্রীবা নববিধা। অসংযুত ও সংযুত রূপে হস্ত সাইত্রিশ প্রকার। পার্শ্বদ্বয়ের কার্য পঞ্চ প্রকার; জঙ্ঘা কর্মও পঞ্চবিধ। এবং শেষে বলা হয়েছে যে নৃত্য ও নাটকে অনেক প্রকার পাদকর্ম প্রচলিত আছে। এখানে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান ও তার ব্যাখ্যা স্থানাভাবে দেওয়া গেল না।

অগ্নিপুরাণের নাট্যচিন্তা বিষয়ক এই আলোচনাও প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। শুধুমাত্র বর্ণিত বা নামমাত্র উল্লেখিত বিষয়গুলিই যথাসম্ভব সংক্ষেপে ও মর্মার্থ অবলম্বনে আলোচিত হল। গবেষকগণের পরিশীলিত তথ্য ও তাত্ত্বিক ও প্রয়োগবিদগণের যৌথ চিন্তভাবনা এর সঙ্গে যুক্ত হলে তবে এই আলোচনা যথার্থ ফলপ্রসূ হতে পারে।*

* এই নিবন্ধের উদ্ধৃত ও মূল অংশগুলি পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বঙ্গবাসী সংস্করণের অগ্নিপুরাণ থেকে গৃহীত।

পুরোনো আমলের নথি-পত্র ও দলিল-দস্তাবেজের ভাষা

ত্রিপুরা বসু

ইতিহাসে নির্মাণের জন্যে যে সমস্ত আকর উপাদান সমূহ প্রয়োজন হয় তার মধ্যে পুরনো আমলের দলিল দস্তাবেজ, তায়দাদ, ছাড়পত্র, দানপত্র, নাদাবী, আমলনামা, ব্যবস্থাপত্র ইত্যাদি অন্যতম। বস্তুতঃ যেদিন থেকে ভারতবর্ষে মতো একটি বিরাট দেশে খণ্ড খণ্ড বা এককভাবে দেশ শাসনের জন্য ক্ষমতাশালী রাজন্যকুল ক্ষত্রিয়গণ আবির্ভূত হলেন, সেদিন থেকেই শাসনকার্য্যে একটি সুব্যবস্থা সম্মত সংবিধান জাতীয় কিছু তৈরী হয়েছিল নিশ্চয়ই। তা না হলে এত বড় একটি দেশ এবং তার বিপুল সংখ্যক মানুষকে শাসন করা কাজটি নিঃসন্দেহে বিশৃংখলার পতিত হোত। ইতিহাসে দেখি, কোন একটি বিশেষ রাজবংশ চিরকাল দেশ শাসন করতে পাননি। "ইতিহাসে ঘটনার পুনরাবৃত্তি"—এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রভাবেই বোধ করি একদা প্রবল প্রতাপান্বিত রাজন্যকুলকে একসময় বিদায় নিতে হয়েছে, আর সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে এসেছেন অপর এক রাজবংশ।

ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের এই সমস্ত বৃহত্তম ঘটনাবলী দেশের নিতান্ত সাধারণ মানুষের জীবনে যত পরিবর্তনই ঘটাক না কেন, বঙ্গীয় সমাজজীবনের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন এমন কিছু প্রভাববিস্তার করতে পারেনি। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উত্থানপতন সমস্ত ক্ষেত্রেই বাঙালীর সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। তাই দেখা গেছে জমি বা ভূসম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়, সম্পত্তি দান বা হস্তান্তর, কোন ধর্মীয় আদেশ বা অনুশাসন, কোন সামাজিক দণ্ডবিধির নির্দেশ, দেবতার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বা সম্পদ দান প্রভৃতি জনজীবনের নিতান্ত নিকটবর্তী ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত নথীপত্র লেখা হয়েছে তার ধরণ ধারনটি প্রায় অপরিবর্তিত থেকে গেছে, বদল হয়েছে তার ভাষার বা শব্দের। দেশের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তার নির্দেশকরণে একটি কৌতুহলোদ্দীপক এবং সুচতুর প্রচেষ্টার পরিচয় দিয়ে এসেছেন এতাবৎ রাজন্যকুল এবং শাসকবর্গ। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে পারি, মুঘল আমলের পার্সীভাষা, ইংরেজ আমলের ইংরেজীভাষা এবং বর্তমান কংগ্রেসী আমলে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেবার পেছনে শাসককুলের যে প্রচেষ্টা, তার পিছনে কাজ করছে এক অতি গূঢ় দূরভিসন্ধি। সোজা কথায় সাধারণ মানুষ অর্থাৎ দেশের অধিক সংখ্যক জনগণ যে ভাষা বোঝে না তাকেই করা হল রাষ্ট্রভাষা। অধিক মানুষকে এই ভাষা থেকে যেন ইচ্ছে করেই অজ্ঞ রাখা হল। এর দ্বারা রাজন্যকুল যে কি অভিপ্রায় চরিতার্থ করতেন এবং এর দ্বারা মানুষের যে কি পরিমাণ ক্ষতিসাধন করা যেতে পারে তা বোধকরি আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

যাই হোক, উর্ধতনকর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রভাষা নিয়ে খুব বেশী মাতামাতি করলেও সাধারণ মানুষ তাদের নিত্যকার জীবনে এমন একটি ভাষাকেই বেছে নিয়েছিলো যে ভাষায় তাদের অধিকার বেশী, দখল বেশী।

মুসলমান শাসনকালে উর্দু বা পার্সীভাষাতেই মূল দলিল দস্তাবেজ রচিত হয়েছিল। এই জাতীয় নিদর্শনাদি অসংখ্য দলিল দস্তাবেজ ভারতের সংগ্রহশালাসমূহে রক্ষিত রয়েছে। কিন্তু ঠিক কবে থেকে

বাংলা ভাষায় দলিল লেখা শুরু হয়েছে তা বলা দুষ্কর। কারণ তা জানতে পারলে বাংলা ভাষার একেবারে গোড়ার দিককার রূপটি হাতে এসে যেত সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

'সাহিত্য' নিয়ে আমরা অনেক বড় বড় কথা বলি। কিন্তু যে সমাজ মানসের দর্পণ হল সাহিত্য, সেই সমাজ মানস সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধানপ্রচেষ্টা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। খৃষ্টীয় ৬০০ অব্দ থেকে ১০০০ অব্দ পর্যন্ত প্রচলিত 'মাগধী' অপভ্রংশ' ভাষার সন্ধান হিসেবে যে প্রাচীন বাংলাকে ধরা হচ্ছে তার সাহিত্য নিদর্শন দশম শতকের 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়', 'দোহাকোষ' ও 'ডাকার্ণব' নামক পদসংগ্রহত্রয়কে খুঁজে বের করা হলেও, ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে কুচবিহাররাজ নরনারায়ণের লেখা একখানি চিঠিকেই প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা হয়েছে। মধ্যযুগের সাধারণ সংস্কার ছিল সাহিত্যকার্যে পয়ার ও অন্যান্য ছন্দের ব্যবহার। গদ্যের ব্যবহার ছিল সংকুচিত। সে যুগে সবই পদ্যছন্দে চলতো বললে ভুল বলা হবে। চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজের মাধ্যম ছিলো গদ্যভাষা। সেকালের সাধারণ গদ্যভাষা এমন কিছু দুর্বোধ্য নয়—'তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।'

১৭শ শতাব্দীতে চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজে বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক বিকাশে প্রবেশ করল অসংখ্য ফারসী শব্দ। 'আসামী মজুককে হুজুর তলপ করিয়া হক ইনসাব করিতে আজ্ঞা হয়'—এ জাতীয় উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এল ইসলামী শব্দসমূহ—'এগার রূপাইয়া পাইয়া স্বইচ্ছাপূর্বক আত্মবিক্রয় হইলাম। তোমার পুত্র পৌত্র আদিক্রমে গোলামি করিব'। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সমকালে যখন মানুষের জীবন পশুত্বেরও নীচে নেমে গেছে, ঠিক তখন মানুষ বিক্রয়ের জন্য রচিত হয়েছে যে সমস্ত দলিল, তাদের ভাষা অনেকাংশে সহজবোধ্য হলেও এর মধ্যে নানা বিদেশীভাষার অনুপ্রবেশকে রোধ করা যায়নি। গৌড় বঙ্গের মুসলমান শাসকগণের ভাষা ও সংস্কৃতিপ্রভাব বঙ্গসমাজে প্রবেশ লাভ করেছে ধীরে ধীরে। তবে সমগ্রভাবে বঙ্গসংস্কৃতিকে গ্রাস করতে যে পারেনি তার প্রমাণ মিলবে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কালে পুত্র গুরুদাসকে লিখিত বিপন্ন রাজা নন্দকুমারের একখানি পত্রের অংশবিশেষ থেকে, 'অদ্য চারিরোজ এথা পৌছিয়াছি। এহার মধ্যে একটি অন্ন যদি দেখিয়া থাকি তবে সে অভক্ষ্য। মুখ প্রক্ষালনাদি কিছুই করিতে পারি নাই। নাসাগ্রে প্রাণ হইল। ফসীহৎ যত যত পাইলাম তাহা কত লিখিব এ সময় তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার তবেই যে হউক নচেৎ আমার জ্ঞান লোপ হইবে।'

বিবাহের শুভ সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য সেকালে যে ব্যবস্থাপত্র তৈরী করা হোত তার ভাষা কিরূপ ছিল, নিম্নে প্রদত্ত দুটি পত্রের ভাষা থেকে তা বোঝা যাবে :—

৭ শ্রী হরি

ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ

স্বস্তিসকলমঙ্গলালয় শ্রীযুত পুরুষোত্তম বিদ্যালঙ্কার বরাবরেষু লিখিতং শ্রীলালমহোন দেবশর্মণঃ শুভসম্বন্ধ পত্রমিদং সন ১১৭৩ সাল অব্দে লিখনং আগে কার্য্যনঞ্চ তোমার পুত্র শ্রীগুরু প্রসাদদেবশর্মণঃ এর আমার কন্যা শ্রীমতী দায়ী দেবির সহিত সুভ সম্বন্ধ নির্ণয় কোরিলাম তাহাতে তোমার কুলমর্য্যাদা পণ ১৪ তঙ্কা দিঞা লগ্নানুসারে সুভ কার্য্য সম্পন্ন করিব ইতি তাঃ ১১ কার্তিক ১১৬৩ সাল এতদর্থে

শুভ সম্পন্ন পত্র দিল কুলাচার্য্যের বিদায় তুমি করিবেন। পণ ১৪৲ জায় দান সামগ্রী ১১৲ বরযাত্র ৩৲ ইহ পত্র মধ্যস্থ শ্রীবীরচন্দ্র শর্মা লগ্নানুসারে যুক্তকার্য্য সংপূর্ণ করিব।

শ্রীলালমোহন দেবশর্মণঃ
সাং দ্বারসিয়ি

সেকালে এক একজন সমাজপতি ব্রাহ্মণ দশ বিশখানি গ্রামের সমস্তপ্রকার সামাজিক নিয়ম-কানুন এবং রীতিনীতির একমাত্র প্রবক্তা ছিলেন। এই পণ্ডিত ব্রাহ্মণের আদেশও নির্দ্দেশানুসারে সমাজের মানুষ তাদের কাজকর্ম করতো। ইনিই ছিলেন ঐহিক, পারত্রিক ও লৌকিক সমস্ত বিষয়েরই উপদেশদানকারী। গ্রামের মানুষ নির্বিচারে এর নিরপেক্ষ বিচার এবং সিদ্ধান্তসমূহ মস্তক অবনত করে স্বীকার করে নিতেন। এজন্যে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ স্বীকার পত্র লিখে নিতেও দ্বিধা করতেন না। প্রায়শ্চিত্ত করবার এরূপ একটি প্রার্থনা ব্রাহ্মণ সকাশে একদা প্রেরিত হয়েছিল :—

"শ্রীশ্রীহরি শরণং

মহামহিম শ্রীযুক্ত বিধি কর্ত্তা শ্রীনাথ ঠাকুর মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীশ্যামচরণ ঘোষ কস্য হকিকত পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চ আগে আমার আন্দাজী বএক্রম তিরিশ বৎশর হইবেক আমি আমাদ্যের ধানের জমীর ধান্য দেখিতে গিয়াছিলাম সেই জমীতে বিড়ের থাক দেওয়া ছিল থাকের মধ্যে ইন্দুর গড় করিয়াছিল সেই দেখিয়া আমি গড়ের মাটি তুলিতেছিলাম এতমধ্যে ডাইন হস্তের মধ্যম আগুলে কামড়াইল তাহার চিকিস্বা করাইলাম তাহাতে সুত্র থাকিল তাহার পর আন্দাজী একবৎসর পরে কর্ণ ফুলিল এবং পাএর বামপত্রের তিনটা মর্দ্দের আগুল ফুলিল কতকদিন পরে চিকিস্বা করাইলাম তাহাতে আরাম না হইয়া ঐ তিনটি আঁগুল লোপ পাইয়াছে ইহার পর আমার কর্ণমূল ফুলে নাই এবং গায়ে দাগ দোগ কিছুই নাই ইহার পর আর কিছুই জানি নাই এহা শ্রীচরণে নিবেদন কোরিলাঙ্ ইতি সন ১২২৪ সাল তারিক ২২ শে পৌষ রাত্তি ইহাতে আমার বোধ হইল আমার কুলবেআধি হইয়াছে এহার পাচিত্তি কোরিব।

আপনারা সাস্ত অনুসারে বেবস্তা দিতে আজ্ঞা হইবে।

ইসাদী

শ্রীগোপীনাথ ঘোষ শ্রীগৌরহরি ঘোষ সর্বসাং ছাতিন গা পার্থনাকারী শ্রীশ্যাম চরণ ঘোষ।"

গ্রামে স্ত্রী বা পুরুষদের চরিত্র ঘটিত যে সমস্ত অপবাদ রটত, সেই সমস্ত অপরাধীগণের সহজে অব্যাহতি লাভের কোন উপায় ছিলো না। এজন্য তাকেও প্রায়শ্চিত্তের বিধি প্রার্থনা করতে হোত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে। অনেক সময় সে যে অপরাধী নয় তা স্বীকারপত্রে ঘোষণা করতে হোত। সেরূপ একটি ঘোষণাপত্র নিম্নরূপ :—

"মহামহিম শ্রীযুত সভাপণ্ডীত
ঠাকুর মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণ মদক

কস্য হকীকৎ পত্র মিদং লিখিনং কার্য্য নঞ্চাগে মৌজে বাইতাড়া পরগণে আজমৎশাহী মৌজে মজকুরে আমার বসত আমার ভাত্রি বধু বিদবা আমার বাটীতে আমার সহিত এক অর্নে ছিল। ঐ

বধূর সহিত কখন দুষ্টজনরব হইয়াছিল কিন্তু গামস্ত লোকে অনেক মত তদারক করিলেক একথা শাবুদ আমি একর্য করি নাই ঐ দুষ্ট বাক্য জনরব হইয়াছে এমতে আমি আপন খুসীতে হকীকৎ লিখিয়া দিতেছি জনরব দুষ্ট বাক্যের শাস্তানুসারে প্রাচ্ছিত্তের বিধি দিতে আজ্ঞা হয় আমি গ্রামস্ত লোক লইয়া এদাএ উদ্ধার হই আর ঐ বিদবা বধূকে আপন ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি। ইতি সন ১২৩০ সাল ১৩ কাত্তিক

শ্রীনবকুমার ঘোষ, শ্রীমানিক চন্দ্র সরকার শ্রীকৃষ্ণ মদক

ইসাদী

সর্ব সাং কাইতাড়া।"

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে আধুনিক বাঙালীর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কেবলমাত্র গদ্যের বাহনে আশ্চর্য কুশলতা লাভ করেছে। এর কয়েকশত বৎসর পূর্বেই গদ্য ব্যাবহার ব্যাপক শুরু হয়েছে। তাই যারা পরম নিষ্ঠা সহকারে বলে থাকেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মণ্ডলী এবং শ্রীরামপুরের মিশনারীরাই বাংলা গদ্যের জনক, তাঁরা ঠিক কথা বলেন না। যারা বলেন ইংরেজরা না এলে এদেশে গদ্যের জন্ম এত তাড়াতাড়ি হোতনা, তাঁরা সত্যকে অস্বীকার করেন। কিন্তু দলিল দস্তাবেজের গদ্যভাষা এবং তার সুস্পষ্ট সাল তারিখের উল্লেখ দেখে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে, ইংরেজরা আসবার অনেক আগেই বাংলাগদ্যের কর্মক্ষম ও ভাবপ্রকাশ অবয়ব গড়ে উঠেছিল। দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মেই ছিল এ গদ্যের ব্যাপক প্রচলন, তা সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করতে পারেনি নানা কারণে।

ইতিহাস নির্মাণ কালে মুদ্রা, পুঁথি, প্রাচীন লিপি, প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্যে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি যেমন মূল উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তেমনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পরিচয় বাহক এজাতীয় প্রাচীন লিপিমালার মূল্যও কম নয়। সেকালে দেশে শাসনকর্তা ছিলো, বিচারক ছিলো, কিন্তু গ্রামীণ জীবনের বিবাদ বিসম্বাদ, আপদ বিপদ, ও বহুবিধ জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যেতো গ্রামীণ মোড়ল, সমাজপতি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে। এই সিদ্ধান্ত, মতামত বা ঘোষণার লিপিগুলিতে সেকালের বাঙালী সমাজের একটা সুস্পষ্ট আলেখ্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়। দুঃখের বিষয়, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান প্রচেষ্টায় পুঁথি, মুদ্রা, প্রভৃতি পুরাবস্তু যতখানি মূল্যবান বলে অনুমিত হয়েছে, ঠিক ততখানি গুরুত্ব এজাতীয় নথিপত্র বা দলিল-তায়দাদের প্রতি আরোপিত হয়নি। দুর্ভাগ্যের কথা সেকাল বাংলার এই সমস্ত অধিকাংশ নথীপত্র ইংরেজ শাসক এবং নীলকর সাহেবদের অনুগ্রহে সুদূর ইউরোপে চলে গেছে। লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া এলবার্ট মিউজিয়ামের 'নথি কক্ষে' এজাতীয় কাগজপত্র ওদেশের ভারততত্ত্ববিদ্‌দের কার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করছে।

জমিদার শাসিত পল্লীবাঙলার প্রকৃত ইতিহাস নির্মাণ করতে গেলে আজো নজর দিতে হবে এ সমস্ত নথিপত্রের দিকে।

এক জমিদার পরিবারে রক্ষিত কয়েকটি প্রাচীন দলিল দস্তাবেজের ভাষা নিম্নরূপ।—

(১) "তায়দাদ নং ২৪৫১৫ মোহর বর্দ্ধমান কালেক্টরী কাদারী এই সকল জমী শ্রীশ্রী ৺ জিয়ু সেবায় দেবোত্তর মোকরর আছে আমাদের পিতামহ ও পীতা ঠাকুর পৈত্রিক বয়েত ভোগদখল

কোরিয়াছেন আমরাও বয়েত ৺জিউ সেবায় করিয়া ভোগদখল করিতেছি শ্রীযুত মারিট সাহেবের ফসল দাড়ি সকল একসিতা দাখিল কোরিলাঙ্ আর দলিল যা থাকে পদাৎ দাখিল করিব ইতি সন ১২০৯ সাল ॥"

(২) "সন ১২০৯ তায়দাদ ২৪৫১৪ শ্রীযুত রাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি জমিসমুদায় মকরার আছে আমাদের প্রপিতামহ ও অন্যান্যাদিগন শ্রীশ্রী ৺ জীর সেবা করিয়া ভোগ দখল করিয়াছেন পৈত্রিক জুরাৎ তামবার্ত্তা ঐ জুরেৎ শ্রীশ্রী ৺ জীওর সেবা করত: ভোগদখল করিতেছি প্রদত্ত মহারাজার তাহার এক কেত্তা দাখিল কোরিলাঙ্ এহা শেওয়ায় অন্য দলিল জে থাকে তাহা দেওয়া করিব। ইতি।"

তাৎকালিক বর্দ্ধমান রাজ মিত্রসেন প্রদত্ত একটি প্রাচীন "আমল নামা" একদা চন্দ্রকোনা শহর থেকে পাওয়া গিয়েছিল। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই জীর্ণ লিপিটির পাঠোদ্ধার করেছিলেন—

" রামজী সহায়

বটে কৌল করাবদা হ্যায় শ্রীমহারাজা শ্রীরাজা মিত্রসেনজী বন্ধুনাথ কবুলিয়াৎ রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী পৌরাণিক কা বেটা গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তীনে পরগনে মানাকা জলদান ধর্মাসন শহরথ খানদান যো কর্ম করে তিস্তো জলদনে মাঙায় লেগা হাম কইদিয়া ত্রিসন্ধ্যা আশীষ দে পরম সুখ মো ভোগ কর আসে তোমারে বাপ কী যো স্ত্রী ও সন্তায়া হ্যায় সবদিনকী অধিকার সো তুম আমল ফলে এহি করার কে দিয়ানিতি শাত্তন বদি ১৩শ সন ১০৭৬ সাল আগে ধর্মাসনকী ভূআসন ॥"

দত্তকপুত্র গ্রহণ করা কতদূর বিধিসম্মত হবে, সেসম্পর্কে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অনুমতি গ্রহণের রীতি সেকালের সমাজে প্রচলিত ছিল। চেতুয়া পরগণার বাসুদেবপুর গ্রামের জনৈকা ভগবতী দেবীর ১১৯৮ বঙ্গাব্দে লিখিত এরূপ একটি প্রার্থনাপত্র নিম্নরূপ:—

"লিখিতং শ্রী ভগবতী দেব্যা ভাষা পত্রমিদং কার্য্য নঞ আগে পরগনে চেতুয়া মৌজে বাসদেবপুর আমার কন্যা পুত্র না হওয়াতে স্বামী মহাশয় আমার সহিত যুক্তি কোরিয়া বংশস্থিতি নিমিত্তক ৺ রামশদয় নামক আমার ভগিনিপুত্রকে দত্তক গ্রহণ কোরিয়া উক্ত দত্তকপুত্রের অন্নপ্রাশন দিয়া করাইলেন কিয়ৎকাল পর আমার ভগিনীর আরযে তিনপুত্র ছিল তাহাদের পরলোক হয়ায় আমি কাতরাপন্ন হইয়া স্বামী মহাশয়কে কহিলাঙ যে যদর্থে দত্তক গ্রহণ করিলেন কৃত দত্তক হইতে আমাদের বংশরক্ষা হয়া ভার তাহাতে স্বামী মহাশয় কহিলেন যে তাহা অদিষ্টাপেক্ষ কর্ম ভগবান এ কর্ম না করুন দৈবাধীনকৃত দত্তকের কোন ব্যাঘাৎ ঘটে তবে পুনরায় দত্তক গ্রহণ করিব নচেৎ অবিদ্যমানে তুমি করিবে তদনন্তর স্বামী মহাশয়ের পরলোক হয়ায় এবং কৃতদত্তকের পরলোক হয়। এক্ষনে মৃত দত্তকের বালিকাস্ত্রী আছে বর্ত্তানে দত্তক গ্রহণ করিতে পারি কিনা এহা শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থা দিতে আজ্ঞা হয় ইতি তাং ২৯ চৈত্র।"

গোহত্যাবশত : প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা করতে হতো সমাজপতি ব্রাহ্মণের নিকট। এরূপ একটি প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা পত্র শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্মণঃ ১২১৭ সালের ১৪ই বৈশাখ লেখেছিলেন—

"লিখিতং শ্রীবিশ্বনাথ দেবশর্মনঃ ব্যবস্থার্থ পত্রমিদং বিশেষঃ পরং আমার একটি গাভি চারি মাসের গম্ভিনী ছিল সেই গাভি আমি সায়ংকালে গোশালাতে বন্দন করিয়া আহারাদি দ্রব্য দিয়া আমি গ্রহেতে আগমন করিলাম রাত্রী মর্দ্ধে আর দেখিনা পরদিবস প্রাতে উটিয়া দেখিলাম জে এই গাভি

মরিয়া রহিয়াছে আহার আদি দ্রব্য জাহা দিয়াছিলম তাহা ভক্ষ্যন করিয়াছে অতএব নিবেদন এহার প্রায়শ্চিত্ত কত কাহন কড়ি উৎসর্গ এবং দক্ষিনা কত কাহন কড়ি করিতে হইবেক এহা ধর্মশাস্ত্রনুসারে ব্যবস্থা দিতে আজ্ঞা হইবেক ইতি।"

জমি জায়গা আদান প্রদানের ক্ষেত্রে যে দলিল ব্যবহৃত হোত তার ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাদামাটা হোলেও কোন কোনটিতে অধিক সংখ্যক ফার্সী ও ইসলামী শব্দও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে আবার কোনটির বিষয়বস্তু ও বিবৃতি নিতান্তই সাধারণ—

"মহামহিম শ্রীযুত বলরামদাষ বৈষ্ণব মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকিন্নুদাষ বৈষ্ণব সাং নিশ্চিন্দীপুর পরগনে বরদা কস্য রসিদ পত্রমিদং কাজানঞ্চ আগে চাকলে বর্দ্ধমান জেলা মেদনীপুর পরগনে চেতুআ তরক দুবরাজপুর মধ্যে মৌজে অ্যারেটি গ্রামের আমার পৌত্রিক ভোগদখলের বৈষ্ণবত্তর বাস্তু মায় বেডবাডি চারি হিস্যায় মবলগে একবিঘা ষোলকাটা আছে এহার অন্দরে আমার নিজহিস্যায় অন্দরে চারি কাটা জমি আপনকে কোওলা লিখিয়া দিয়া বিক্রয় কোরিলাম্ ঐ কোওলায় জমির দাম রোককন সিক্কা ছয়টাকা সন ১২২৮ সাল ২৩ তেইস্যা আসাড়ের বুকৌয়া পাইয়া রসিদপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি—

ইবাদ শ্রীকিন্নুদাষ বৈষ্ণব সাং নিশ্চিন্দীপুর "

তখনকার দিনে পুঁথিনকল কার্য্যটি ছিল একটি শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তাই হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকে মূল পুঁথি হাতছাড়া করতে চাইতো না। পুঁথি গ্রহণ করার আগে নিম্নোক্তভাবে স্বীকারপত্র লিখে দিতে হোত—

শ্রীশ্রীরাম সহায়

শ্রীমুকুলমুঞ্জরী ঠাকুরজীউ

লিখিতং শ্রীমানিকচন্দ্র দেবশর্মা

একবার পত্রমিদং সন ১২১৫ পন্দর সাল লিখনং কার্য্যনঞ ত্যাগে সন ১২০৫ সাল আমার শ্রীযুক্ত ঠাকুর আপকারা স্থানে হইতে পুঁথি লইয়া আসীয়াছিলেন সন ১২১৩ সালে সেই পুথি নওবাজার মোকামে পাঠ করিয়া এখানে ছিল—সেই সঙ্গে সে পুঁথি লইয়া সহরে সেবক বাটীতে রাখিয়াছি প্রবাষ করিয়া জাইবারকালে সহর হইতে পুঁথি না দেই এবার খিলাপ করি আপনি জে দাওয়া কোরেন তাহা বেওজার নিসা করিবো এতদর্থে একবার পত্রদীলাম ইতি তারিক ২০ বিশ বৈশাক

ইসাদী

শ্রীগুরুপ্রসাদ দেবশর্মা শ্রীবদনচন্দ্র দাশ

শ্রীগউরমহোন দেবশর্মা সাং সামুদ

শ্রীজয়দেব দাশ শ্রীনীলাচল বহর

সর্ব সাকিম নাগিগ্রাম সাং সামুদ"

গদ্য ভাষায় দলিল দস্তাবেজ ঠিক কবে থেকে লেখা শুরু হয়েছে তা বলা শক্ত একথা আগেই বলেচি। তবে বাংলার দলিল লেখা প্রচলন হলেও এর সঙ্গে সমান তালেই চলেছে পার্সী হরফে লেখা দলিল দস্তাবেজ। এমনকি বাংলা তায়দাদের পার্শ্বে পার্সীতে দুচার লাইন লেখা দেখা যাচ্ছে।

হয়তো সরকারী কার্য্যের সুবিধার জন্যই এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকবে।

সামাজিক ইতিহাসের ক্রমবিবর্ত্তিত ধারাটিকে জানতে হলে এই সমস্ত অবহেলিত ও অনালোচিত পত্র-পত্রাদির দিকে দৃষ্টি দেওয়া সবিশেষ প্রয়োজন। সেকালে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য, সাধারণ মানুষের নিত্যকার জীবনযাত্রা, আয় ব্যয়, আদান প্রদান কেমন ছিল তা জানার নির্ভরযোগ্য সূত্র হোল এই পুরোনো দলিল দস্তাবেজগুলি। কালের মহাপ্রান্তরে হারিয়ে গেছেন এসবের লিপিকারগণ, কিন্তু ছিন্ন ও বিবর্ণ নথীপত্রের অঙ্গে লিখে রেখে গেছেন সমকালীন সমাজজীবনের নিতান্ত খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ।

নির্দেশিকা। বীরভূমের ইতিহাস—গৌরীহর মিত্র, Types of Bengali Prose—Calcutta University Bengal Manuscript Reports Vol I. W. W. Hunter প্রবন্ধকার সংগৃহীত প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় The Annals of Rural Bengal-Hunter.

মানভূমের কথ্যশব্দার্থ

রামশঙ্কর চৌধুরী

প

পটং—পাতার ঠোঙা।

পয়না—পোনা।

পালৈ—ধানের আঁটির সুবিন্যস্ত গাদা।

পুয়াল—খড়।

পোখোর—পুকুর।

পোল্যা—প্রলেপ, খোসামুদি।

পুয়াতি—গর্ভবতী নারী।

পিসি ডালা—বিয়ের সময় একটি ডালা বা স্থপে পাঁচ পোয়া চাল একটা লাটাই এবং একটি শাড়ী থাকে। এইটি পিসিমার প্রাপ্য।

পানি-সায়া—বিয়ের দিন পাত্রের ঘরের সধবা মেয়েরা পিসি ডালা পান পাতা ইত্যাদি নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। পানি-সায়া শেষ হলে পাত্র বিয়ের জন্য যাত্রা করে।

পিড়া—পিড়ি, বারান্দা।

পোংখ—ফাজিল।

পাস্থরা—ভুলে যাওয়া।

প্যাগা—আবদার।

পুয়া—সেরের এক চতুর্থাংশ। পোয়ানো

পো—ছেলে।

পেছা—ছোট ঝুড়ি।

পিছা—ঐ

পাই—সেরের অর্ধাংশ। গোরুর গাড়ির চাকার মধ্যাংশ।

পাথরি—পাথর নির্মিত থালা।

পলাবী—পাথরের থালা (বাঁকুড়া)

পোলৈ—মাছ চেপে ধরার জন্য সরু সরু কাঠ দিয়ে নির্মিত এক ধরণের আটকা, চেপে ধরলে পাকের মধ্যে এর প্রান্তটি ডুবে যায় এবং মাছ আটকে থাকে।

পোখোর যাওয়া—প্রাতঃকৃত্য করতে যাওয়া।

পোখোর হওয়া—পাৎলা দাস্ত হওয়া।

পাঁশুটা—ছাই।

পৈলা—প্রথম।

পোলান—চারা পুতবার আগে মাটিকে সমান করে নেওয়া।

পাতনা—জল রাখবার বৃহৎ মৃৎপাত্র।

পো—ধুয়া।

পোষাল—বনভোজন।

পিরান—জামা।

পুটি—মাছ বিশেষ।

পুটি—মলদ্বার।

পিয়ান—দুধ দুইবার আগে বাছুরকে দিয়ে দুধ খাওয়ানো।

পহিল্—প্রথম।

পাটি—উদলের সংযোজনকারী কাঠ সমূহ। একটি যথা এক পাটি জুতা।

পাড়ম্—কচুড়ি রাখবার জায়গা বিশেষ।

ফ

ফাল—লাঙলের ফলা।

ফাড়ানি—মেয়েদের পরিধেয় হাত তিন লম্বা তাঁতের কাপড়।

ফাড়া—চিরা।

ফাবড়া—ছুড়ে দেওয়া।
ফিকা—ঐ
ফঁপরা—শাঁসহীন, ফাঁকা।
ফঁপর দালাল—যে শুধু শুধু বড়ো বড়ো কথা বলে।
ফচ্‌কা—ফাজিল।
ফুল—বিশেষ বন্ধু, একটি অনুষ্ঠান করে একজন আরেক জনের সঙ্গে ফুল পাতায়, তখন এরা উভয়কে ফুল বলেই ডাকে।

ব

ব—অব্যয়, যথা কি ব?
ব্যাৎ—মুখ।
বিক্‌লা—চ্যাচানো।
বেজাম—দ্বিপ্রহর।
বেলি—বেলা।
বতর—উপযুক্ত সময়।
বিড়া—ধানের আঁটি, কলসী বসাবার জন্য পাকানো বৃত্তাকার খড়।
বিবি—বিউলি।
বুট্‌—ছোলা।
বহেড়া—বহড়া।
বাঁদ—একদিকে পাড় বিশিষ্ট জলাশয়।
বাগোন—বেগুন।
বিলাতি—টমেটো।
বিলাতি বেগোন্‌—টমেটো।
ব্যাসার—সরষা।
বা-ইদ্‌—উচু ধেনো জমি।
বহাল—বয়াল জমি।
বাগাল—রাখাল।
বাঁকি—কাঠের সিঁড়ি।
বাদল—বর্ষা।
বাঁদানি—বিয়ের পর দিন বর কনেকে ছাদনা তলায় বসানো হয় এবং আশীর্বাদী দেয়া হয়।
ব্যা-গত্তা—সনির্বন্ধ অনুরোধ।
ব্যাসাতি—তরকারি, ব্যঞ্জন।
বাখান্‌—গালাগালি দেওয়া।
বাখোল—পাশাপাশি কয়েক ঘরের সমষ্টি।
বাড়ি—ঘরের পিছনের অংশ।
বনা—কুটা, পাখী বিশেষ।
বাঁদনা—এক ধরণের পর্ব, গোরুকে পূজা করা হয়। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন এর রূপ সাঁওতালদের এটি একটি বড়ো পরব।
বিয়া—বিবাহ।
বিহা—ঐ।
বিয়ালা—বিবাহিতা।
বিয়া-ন—প্রসব করা।
বিয়ান্‌—বেয়ান্‌ (বেয়াইএর স্ত্রী লিঙ্গে)
বাঁ-এ্যা—চাষ করার জন্য হাল দেওয়া।
বড়্‌—বট্‌ গাছ, কচুড়ি বা মরাই-এ বেড় দেবার জন্য খড় দিয়ে তৈরী বিশেষ দড়া সদৃশ বস্তু।
বালস্‌—কচি ছেলে।
বোল—বকুল, তবলা বা শ্রীখোলের আওয়াজ।
বিত্তাপ্‌—ঝামেলা, অনর্থ।
বাদাড়—সরু সরু কাঠ দিয়ে চাটাই বোনার মত করে তৈরী বেড়া।
বেসাদ্‌—বিস্বাদ।
বাইশী—মজলিশ, সভা, নিম্নবর্ণের মানুষের সামাজিক কোনো গুরুতর বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বাইশী ডাকে।

বাঁ-ট—ষষ্ঠী পূজার প্রসাদ। এই প্রসাদ ছোলা ভিজা দই ফল দেওয়া হয়।
বিহন—ভোর।
বিচ্‌—বীজ।
ব্যাগড়া—কাজে বাধা দেওয়া।
বেট—ব্যাগার।
বকনা—গোরুর বাচ্চা।
বার-ভাতারী—যার বারোটি স্বামী।
ব্যালনা—যা দিয়ে রুটি তৈরী করা হয়।
বোথড়া—ভোতা হয়ে যাওয়া।
বুটিং বা বটিন্‌—বঁটি।
বিলাৎ—কোনো বস্তু বা অর্থ কাউকে দিলে তা আর যখন ফিরে পাবার আশা থাকে না।
বিলা—বিলি করা।
বিরাল—বিড়াল।
বিঁদা—বিদ্ধ করা।
বাড়ন্ত—শূন্য (চাল বাড়ন্ত)
ব্যাবাক বা বিবাক—সমস্ত।
বেজায়—ভীষণ।

ভ

ভাল—তাকানো।
ভ্যালা—ডোঙা, ভালো, ফল বিশেষ।
ভোড়—পা।
ভৈল—ভেক।
ভুলুক—বড়ো ছিদ্র।
ভাদ্রব—ভাদ্র।
ভেঙ্গ—ভাজ।
ভেগা—ল্যাঙ্গট সদৃশ পরিধেয়, এক দেড় হাত লম্বা অর্ধ হাত চওড়া ন্যাকড়া।
ভোগ—ঠাকুরের প্রসাদ।
ভাজাপড়া—প্রথম পোয়াতীকে পাঁচ মাসে নানা প্রকারের ভাজাপোড়া দেওয়া হয়।
ভুজা-ন—অন্নপ্রাশন।
ভাচা—পরের ধান থেকে চাল করে দেওয়ার জন্য ধানে যে মজুরী দেওয়া হয়।
ভ্যাবা-চ্যাকা—কিংকর্তব্য বিমূঢ়তা।
ভেতা—রক্তহীন মাছ বিশেষ।
ভাদু—চাষীদের একমাসব্যাপী উৎসব। এই উৎসব ভাদ্র মাসের প্রথম দিন থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে। প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েরা একটা জায়গায় জমা হয়ে নিজেদের তৈরী গান গায়। এ গানের বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অভিজ্ঞতার ফসল। কোন কোন স্থানে ভাদ্রের প্রথম দিনেই একটি প্রতিমা নিয়ে আসে। কোথাও আবার সংক্রান্তির আগের দিন নিয়ে আসে। সংক্রান্তি দিন সারারাত্রি জেগে মেয়েরা গান গায়। একে ভাদু জাগরণ বলে।
ভাজা—মুড়ির চাল।
ভার—দায়িত্ব। অধিবাসের ভার ছুটি ছোট কুচুড়িতে চাল কলাই পাঠানো হয় মেয়ের বাড়ীতে। এই ভার পৌছানোর পর কন্যার পিতা জল গ্রহণ করেন।
ভাজ—ভাইয়ের স্ত্রী।
ভাজ-বৌ—ঐ
ভদ্‌সা—জলো, স্বাদহীন।
ভিটা—মাটির ঘরের বাসিন্দা চলে যাওয়ার পর যে ভগ্নস্তূপ পড়ে থাকে।

ভিট-ফুটা—স্তূপাকার করে দেওয়া প্রচুর।
ভাতার—স্বামী।
ভাদর—ভাদ্র।
ভাসুর—স্বামীর বড় ভাই।
ভেলি—কোনো রোপণ করার জন্য সারি। এই সারির নীচেই জল যাবার নালি থাকে।

ম

মু—মুখ।
মুড়—মুণ্ড।
মুড়ি—মুণ্ড।
মুড়া—মুণ্ড।
মাগ—মাঘ মাস।
মাগী—অসম্মানার্থে স্ত্রীলোক।
মোহুল—মহুয়া।
মুলুন—মৃণালের যে অংশ মাটির নীচে থাকে।
মদ্দা—পুং জাতীয় জীব।
মেদী—স্ত্রী জাতীয় জীব।
মেদ্দী—ঐ
মাদার—আতা।
মাড়—ভাতের ফ্যান্।
মাড়া—ধান বা কলাই পিটে বের করার পর যে অংশ থাকে তাকে বিছিয়ে বলদ দিয়ে বিছিন্ন করার বিশেষ পদ্ধতি।
মোরচা—মরিচ, লংকা।
মোড়্—বরের মুকুট।
মাড়ুলি—গোময় দিয়ে বৃত্ত। গৃহস্থের বাড়ীতে প্রতি সকালে মেয়েরা সদর দরজায় গোময়ের বৃত্ত করে তার চার ধারে জল ছিটিয়ে দণ্ডবৎ করে।
মরাই—ধান রাখবার বৃহদায়তন বস্তু। এই মরাই এ ১০০ মণ ধান রাখা যায়। প্রথমে চারি পাশে লম্বা লম্বা খড় দাঁড় করিয়ে তার চার পাশের বেড়া বড়্ দিয়ে করে দেওয়া হয়।
মেটানো—মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া। অস্তিত্ব লোপ করা।
মৈ-মালট্—একাকার।
মুকুল—বোল।
মুহান—সুখ। সম্মুখ ভাগ।
মাইন্দার—সর্বক্ষণের মুনিষ।
মান্দার— ঐ
মাকন্দা—মিত বর।
মেড়্—প্রতিমার চাল।
মুট্—কার্তিকে পাকা ধান আড়াই মুঠি কেটে আনা। এই দিন পবিত্র অবস্থায় থেকে উপবাসী কোন পুরুষ নূতন কাপড় হলুদে রঙিয়ে শঙ্খ-বরণে সহ নিয়ে এসে লক্ষীর বেদীর উপর স্থাপন করে। এই ধান দিয়ে নবান্নের উৎসব হয়।
মুদুল—খড়ো ঘরের মাঝের দীর্ঘ কাঠ। এই কাঠের উপরই নির্ভর করে থাকে কাঠামো।
মগ্‌রা—কোঠা বাড়ীর আবৃত দাওয়া।
মাদি—জিনিস রাখবার কাঠের তৈরী উচু জায়গা।
মই—জমির মাটি সমান করার সরঞ্জাম।
মাচান্—জিনিস্ রাখার জন্য দেয়াল সংলগ্ন উচু জায়গা।
মিয়্যা—স্ত্রী
মালই-চাকী—হাঁটু।

য

যোড়ন—ঐক্যতান বাদন। দুটি অংশের সংযুক্ত স্থান।
যোট্—তুল্য, সঙ্গ।
যুটি—সঙ্গী।

র

র—থামা (wait)
রু-আ—বোপন করা।
রুয়াঁ—লোম।
রহনী—বোহিনী।
রাম ঝিঙা—ঢেড়স্।
র‍্যাগা—ফাজিল।
রহম—মেজাজের উপর গোরুর চলন।
রগ্‌দা—পিষে দেওয়া।
র-গা—কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ মানুষ।
রোগষ্টা—রোগ জীর্ণ।
রো—চোখের জল।
রা—কথা।
রা-কাড়া—কথা বলা।
রট্-রটায়—খুব শক্ত করে
রাস্‌কা—ধান বোপনের আগে জমি সমান করার বিশেষ সরঞ্জাম।
রে ড়া—ধান মাড়াই।
রগ্‌ড়া—ঘষা।
রগড়্—জিদ্, কেঁদে কেঁদে জিদ ধরা।
রাঢ়্—নাড়, বিধবা।
রসা বা রশি—দড়ি।
রোক্ বা রোহক—থাক্।
রোকা—মুনিষ খাটানোর পর তাকে কাগজে তার প্রাপ্য অন্যের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার স্লিপ্।
রুঁদ্—বেড়া (কাঠের)
রুঁদা—বেড়া দেওয়া (কাঠের)

ল

লাই—নাভী।
লা-ইড়—প্রসব কালীন প্রসূতের নাভী সংলগ্ন নালি।
লরাত—প্রসবের নয় দিনের অনুষ্ঠান।
লাচ্—নৃত্য, সদর (লাচ্ দুয়ার)।
লাচ্‌নী—নর্তকী।
লাকার—বমি বমি ভাব।
লছ্‌না—না-জানার ভান।
লালা—নালি, রস, লোভী।
লাল্—মুখ থেকে যে জল গড়িয়ে পড়ে।
লস্‌কা—উঁচু জায়গায় আটকে থাকা।
লখ্‌না—লক্ষণ
লহর্—ঠাট্টা, জেনেও না জানার ভান।
লহরুগা—যা খুশি কর-ফলা ফল কিন্তু ভালো হবে না।
লোহ—রক্ত।
লোহলান্—রক্তাক্ত।
লো—গো।
লোল্—আল্‌গা
লদক্-পদক্—খুব নরম।
লিড়ান্—নিড়ান্
লিঘা—দুটি চাকাকে যুক্ত করে রাখার কাঠের বা লৌহের দণ্ড।
লিয়র—ঠাণ্ডা।
লিজানী—শ্মশান যাত্রী।
লারা—না-পারা
লাড়া—স্পর্শ করা
লিয়াই—ঝগড়া।
লুরি—লরী।
ল্যাংচা—খোড়া
ল্যাঠা—হাঙ্গামা
ল্যাসা বা ল্যাপা—প্রলেপ দেওয়া।

কয়েকটি আঞ্চলিক লোকক্রীড়া

কনককান্তি বসু

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে বিশেষ বিশেষ ভূমিখণ্ড ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য হয়েছে। এই বিচ্ছিন্নতা কল্যাণ অকল্যাণ যাই করুক অন্তত কোন কোন জনপদ ও অধিবাসীর সংস্কৃতিকে যে বিশিষ্ট এবং আঞ্চলিকতায় চিহ্নিত করেছে সেবিষয়ে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ নেই। লোকক্রীড়ার ক্ষেত্রেও এই বিচ্ছিন্নতা অনেকগুলি আঞ্চলিক ক্রীড়ার জন্ম দিয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রে সমীক্ষায় এ ধরণের বিচ্ছিন্ন অঞ্চল হিসেবে আমরা মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের নামোল্লেখ করতে পারি। বর্তমানে মালদহ যদিবা সেই পরিমাণে বিচ্ছিন্ন নয় কিন্তু পশ্চিম দিনাজপুরের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা আজও বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। এই দুটি জেলায় ভিন্ন ভিন্ন বয়েসের উপযোগী বেশ কয়েকটি লোকক্রীড়ার প্রচলন রয়েছে যা অন্যত্র অনুষ্ঠিত হয় না। এই ক্রীড়াগুলির কোন কোনটি ধর্মীয় কর্মকাণ্ড থেকে জন্ম নিয়েছে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মত পঞ্জিকা, দিনক্ষণ দেখে তা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে আঞ্চলিকতাই সেই ক্রীড়ায় বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, নামেমাত্র ধর্মগন্ধ তার গায়ে লেগেছে। আসলে লোকক্রীড়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী লোকসমাজই বড় কথা, আনুষ্ঠানিক ধর্ম নিশ্চয়ই বড় নয়। এইদিক থেকে হকাহকি খেলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

হকাহকি খেলা মোটামুটি মালদহ এবং পশ্চিম দিনাজপুরের বিশিষ্ট আঞ্চলিক খেলা। এ খেলায় বয়েসের সীমারেখা তেমন নেই। যে কোন পুরুষ সদস্যই এতে যোগ দিতে পারেন। অনুষ্ঠানের তারিখ পঞ্জিকা দিয়ে স্থির হয় কার্তিক মাসে অমাবস্যার রাত্রে সাধারণত এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। পটভূমি হিসাবে প্রথমেই এই লোকক্রীড়াটিকে পিতৃপূজার অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকারে পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ যখন কিছুই দেখতে পান না তখন মর্ত্যলোকবাসী আত্মজন পিতৃপুরুষদের হকাহকি খেলার মাধ্যমে আলো ধরে সুবিধে করে দেন এবং পরিবর্তে বিদেহী পিতৃপুরুষ খেলোয়াড়দের প্রতি অনুকূল হন। তাছাড়া বিষ্ণুলক্ষ্মীকে কার্তিক মাসে আলোকদানের ব্যাপারও হকাহকিতে এসে গেছে। এই বিষ্ণুলক্ষ্মী আবার শস্যভাণ্ডারের মঙ্গলামঙ্গলের দায়িত্ব উত্তরবঙ্গের কোন কোন স্থানে নিয়েছেন। পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার কয়েকটি গ্রামে হকাহকি অনুষ্ঠান হয়। ইসলামপুরের এইসব গ্রামের সঙ্গে পশ্চিমবাঙলার অন্যান্য স্থানের কোন সুবিধাজনক সংযোগ ব্যবস্থা আজও নেই। গুঞ্জারিয়া রেলস্টেশন এই অঞ্চল থেকে অন্ততঃ সাত আট মাইল দূর। ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য উচ্চবর্ণের হিন্দুর চিহ্ন এখানে নেই। অধিবাসীরা রাজবংশী, হাড়ি এবং মুসলমান। এই পরিমণ্ডলে ইসলামপুরের গ্রামে যে হকাহকি খেলা হয় তা দেবদেবীমূলক না বলে ফসল উৎসবের অঙ্গ বলাই সঙ্গত। ফসল ফলানোর ব্যাপারে যিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তিনি যে ধর্মের যে বর্ণের মানুষ হন না কেন তিনি হকাহকিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। এখানে আশ্বিন সংক্রান্তির দিন থেকে গ্রামের মানুষ বাড়ি ও ক্ষেতে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালেন। ক্ষেতে একটা ঘর তৈরী করে দেবী লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়, পাকা ফসল রক্ষা করার জন্য। এই

প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান হকাহকির একটি অঙ্গ এবং একে বলা হয় রাত্রি পূজা। এর পরেই শুরু হয় গরুগুলিকে যত্ন করা। এই সময়ে তেল-সিঁদুর দিয়ে সমস্ত গবাদি পশুকে সাজানো হয় এবং কালীপূজোর পরের দিন পাটকাঠির গোছ ধরে আগায় আগুন দিয়ে ক্ষেতময় ছোটাছুটি করে আকাশের দিকে ছুড়ে দেওয়া হয়। হকাহকির খেলায় যে গানটি মালদহ জেলায় শুনতে পাওয়া যায় তা হল, 'হকারে হুকিরে পোকামাকড় রে স্বর্গে যা।' অবশ্য পশ্চিম দিনাজপুরে কোন ছড়া বা গানের কথা শোনা যায় নি।

হকাহকি উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দুটি জেলার মধ্যে প্রচলিত থাকলেও এই দুই জেলার অনুষ্ঠানেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নজরে আসে। মালদহে রাজমহলের কাছে মীরপুরে যে হকাহকি খেলা হয় তাতে ক্রীড়ানুষ্ঠানের পরে অংশগ্রহণকারীরা অবশ্যই পঁচিশ রকমের ভাজা খাবেন। পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর, কালিয়াগঞ্জের অনেকগুলি স্থানের অনুষ্ঠানে ঐ রকম কোন প্রথা নেই। আবার পশ্চিম দিনাজপুরের খেলা শেষে ঐ দগ্ধ পাটকাঠিগুলিকে ক্ষেতে পুঁতে রাখা একটি অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু মালদহে তেমন কোন বাঁধাধরা ব্যাপার নেই।

হকাহকি আপাতদৃষ্টিতে নেহাৎই ধর্মানুষ্ঠান মনে হতে পারে। কিন্তু গ্রামসমেত সকলে যখন শোভাযাত্রা করে ছড়া কাটেন তখন মুহূর্তে তার ধর্মের নামাবলী খসে যায় এবং সর্বধর্মের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে তা প্রকৃত লোকক্রীড়ায় পরিণত হয়।

পশ্চিম দিনাজপুরের করণদীঘির কাছে কামাড়তোড়ে 'নারকেল খেলা' নামে যে খেলাটির প্রচলন আছে সেটি আধুনিক রাগবি খেলার স্বগোত্র একটি প্রাচীন লৌকিক খেলা। পুজোৎসবের মেলা-প্রাঙ্গণে খেলোয়াড়রা নারকেল খেলার জন্য একে একে হাজির হন। সমস্ত পুজোৎসবেই যে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয় এমন নয়। তবে জন্মাষ্টমীতে নারকেল খেলা হবেই। যে কোন লোক দুই হাতের মুঠোয় একটি নারকেল নিয়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং অন্যান্যরা সংগে সংগে সেই ব্যক্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের নারকলটি কেড়ে নেবার জন্য। তিনিও তাদের প্রতিরোধ করতে থাকেন। এই ভাবে লড়াই শুরু হয়, সমবেত দর্শক এক একটি পক্ষ নিয়ে মাতামাতি করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত নারকেলটি যিনি কেড়ে নিতে পারেন তিনি বিজয়ী ঘোষিত হন এবং নারকেলটির মালিক হন। এই ভাবে ক্রীড়াক্ষেত্রে আরো খেলোয়াড় অবতীর্ণ হন এবং দীর্ঘ সময় ধরে খেলা চলতে থাকে। 'গেণ্ডু' নামের লোকক্রীড়ায় অনেকটা এই ধরণের ঝাঁপিয়ে পড়া কখনো কখনো দেখতে পাওয়া যায়, শারীরিক পটুতা ছাড়াও উপকরণের সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু নারকেল খেলাটি সম্পূর্ণ দৈহিক কসরতের খেলা বলেই মনে হয়েছে।

পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুরে ধর্মীয় মোড়কে একটি মজার খেলা চালু আছে। এটির পরিচিতি 'চোরপূজা' খেলা হিসাবে। যদিও আতপ চাল, নৈবেদ্য সাজিয়ে নানারকম ফলমূল দিয়ে এমনকি পায়রা পর্যন্ত বলি দিয়ে চোরের পুজো দেওয়া হয় তবু এটি কোন লৌকিক দেবদেবীর পুজো নয়, পৌরাণিক দেবদেবী তো নয়ই—নেহাৎই শিশুতোষ আভিনায়িক লোকক্রীড়া। কালীপুজোর দিন থেকে চোরপুজোর খেলা সুরু হয়। গ্রামে বেশ কয়েকটি ঘর আছে যাদের ছেলেরা শোলার মুখোস পরে কালীপুজোর রাত্রে বাড়ীতে বাড়ীতে নানা ভঙ্গী করে হাজির হয়। বাড়ীর লোকজন হরেক রকম মজা করে সেই মুখোশধারী চোরপুজোর খেলোয়াড়কে কিছু পয়সা দেয়। এই ভাবে বেশ কয়েক রাত্রি

মুখোশ পরে পয়সা তুলে তারপর চোরপুজোর নামে একটি অনুষ্ঠান করা হয়।

কেহ চায় অমৃত কেহ চায় ধন।
কেহ চায় ঐরাবত গজের প্রধান॥
কেহ চায় লক্ষ্মী কেহ চায় হয়।
কেহ চায় কৌস্তুভমণি কেহ চায় ঠায়।
মোহিনী মোহিনী আসি বিবাদ থামায়।
রাহু এসে চুরি করে অমৃত যে খায়॥
ঘুরিয়া ফিরিয়া চোর বেড়ায় উঠানে।
বন্দী লাগে বরে রাম ভাইহে লক্ষ্মণে॥

শৌর্যবীর্যের একটি খেলা যেটি পশ্চিম বঙ্গে প্রায় গল্পের বস্তুতে পরিণত সেই বাইচ বা নৌকো প্রতিযোগিতা আজও মালদহ এবং উত্তর বঙ্গের দুয়েকটি জেলার শতসহস্র মানুষের আনন্দের কারণ হিসাবে রয়েছে। ২৪ পরগণার হাড়োয়ার ঘুসিঘাট ছাড়া মালঞ্চ ও চৈতলঘাটে যে বাইচ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হত মনসা ভাসানের দিন এ বৎসর নদীতে দুর্ঘটনার জন্য বাতিল হয়ে যায়। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি বাইচ প্রতিযোগিতা লৌকিক স্তরে অনুষ্ঠিত হয় তার বেশীরভাগ হয় মালদহে।

প্রাকৃতিক ষড়ঋতুর চক্রবৎ আবর্তনের সংগে তাল রেখে যেন লোকসমাজ তার ক্রীড়াকৌতুকের পসরা সাজিয়েছে। যে বর্ষার পদধ্বনি শুনে জেলায় জেলায় মাঠের মানুষ বাইরের মানুষ ঘরে ফেরে সেই বর্ষার শ্যামের বাঁশি শুনে কেউ কেউ আবার ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। ঝমর ঝমর বৃষ্টির ছন্দে ছলাৎ ছলাৎ দাঁড় টানে—প্রকৃতি তখন তাল রাখে মেঘের মাদলে, যেন মূল বাদ্যিকরের দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হচ্ছে।

আকাশ বাতাস কাঁপানো দুই তীরের মানুষের অগণিত কণ্ঠনিনাদ, ফুলে ওঠা নদীর বুকে তোলপাড় নাগর দোলা, আদি এবং অকৃত্রিম জলযান নৌকো-দৌড়ের বীরত্ব ব্যঞ্জক, চকিত শাণিত বুদ্ধির এই লোকক্রীড়া বাইচ খেলা নামে পরিচিত। পর্যায় বিভাগ অনুসারে এটি উপকরণসহ জল-ক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই খেলার উৎকর্ষ বিচার হয় প্রতিযোগিতা মাধ্যমে। উচ্চকোটির সমাজে বাইচ কোন অশ্রুতশব্দ নয়, লৌকিক বাইচ সহরাঞ্চলে প্রচলিত বিদেশী ঢঙ্গের বাইচ থেকে সমস্ত দিকের বিচারেই পৃথক্। লৌকিক বাইচ প্রাচীন বাংলার নৌযুদ্ধ মহড়ার অবশেষ বলে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

পশ্চিমদিনাজপুরের দৌলতপুর একটি অতি প্রাচীন গ্রাম। এখানকার থানাগুলিতে পড়ে থাকা অসংখ্য পালযুগের মূর্তি অন্তত হাজার বৎসর আগে এলাকাটির ঐশ্বর্যের কথা ঘোষণা করে। এখনো জলাশয় থেকে মাঝে মাঝে ভগ্ন মূর্তি উঠে থাকে। চতুর্দিকে পুরাবস্তুর মাঝে 'তুবড়ী বাজী' এখানকার একটি ঐতিহ্যপূর্ণ যাদুখেলা হিসাবে এখানে গুরুত্ব পায়। সম্প্রতি এই যাদু-খেলোয়াড়দের সংখ্যা কমে এলেও এটি একেবারে লোপ পায়নি। সামনা সামনি কয়েকটি দল ক্রীড়াক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যায়। খেলোয়াড়রা একে অন্য দলকে ভাজা কড়াইগুলি ছুঁড়ে দিয়ে উচ্চারণ করেন,—

শঙ্খের পুত শঙ্খের বেটি
বাণ-অবাণে কাটাকুটি॥
বাণ কাটম
কুঞ্জান কাটম
আল্লা, মোল্লা, তাল্লা, কাটম
গৌরার অঙ্গে মারিল বাণ
বুলবুল চণ্ডীর বরে আমি
তরে করি খান খান

অপরপক্ষ এবার খানিক স্তব্ধ থেকে আবার তাদের ক্রিয়া সুরু করে,—

প্রসাদ পাথয়স্তি তে।
ছুটিলাম দিক দিগন্তে॥
সংঘাতৈঃ সর্বদেবতা
জননী জগতের মাতা॥
প্রস্তরে সর্বগাত্রাণাং।
হুংফট্ রজনী স্বাহা॥

এইভাবে একপক্ষ যদি বানর বাণ-ছোঁড়ে তো অপরপক্ষ অবশ্যই গাছের ডালে উঠে বানরের মত নাচানাচি দাপাদাপি করবে। তেমনি ঘোড়া বাণে মাঠে মাঠে ঘাস খেতে হয়, কুমীর বাণে বুকে হেঁটে যেতে হয় এবং মৌচাক বাণে মৌমাছিদের মত মধু সংগ্রহের কাজ করতে হয়, হুল ফোটাতে হয়। তুবড়ী বাজী মূলত যাদুক্রিয়ার অন্তর্গত। একসময়ে পশ্চিম দিনাজপুরের বেশ কিছু মানুষ তুবড়ী-বাজীকে পেশাকরে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বর্তমানে সেই সংখ্যা অনেক কমে গেছে এবং যাদুক্রিয়া ও বিশ্বাসমূলক বিভূতি প্রদর্শন থেকে আভিনায়িক লোক ক্রীড়ায় পরিণতি ঘটেছে গুণিন্ খেলা তুবড়ী বাজীর। আরো কিছু সংখ্যক আঞ্চলিক লোক ক্রীড়ায় সন্ধান উত্তরবঙ্গের এই দুটি জেলায় পাওয়া গেছে কিন্তু নামে ভিন্ন হলেও অন্যত্র প্রচলিত ক্রীড়াপদ্ধতি থেকে তা ভিন্ন নয় এবং সেই কারণে বর্তমান উপস্থাপনায় সেগুলি বাদ দেওয়া হল।

আ লো চ না

বইয়ের মলাট

বই বা গ্রন্থ, পুস্তক-পুস্তিকা নিয়ে আমরা অনেকেই ব্যস্ত থাকি। এই যোগাযোগটি ঘটে ছাপান বইয়ের সঙ্গে নানা ব্যবহারিক ও নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে। অতএব ভিতরের দিকে না গিয়েও সোজা সুজি মলাটের কথায় আসা যায় সহজেই। নমনীয় মলাট, বাঁধানো শক্ত মলাট আর মোটা কাগজের ধুলা নিবারক আচ্ছাদনী এই সব রকমারি আবরক বা পুস্তকাবরণ আমাদের কাছে সুপরিচিত। মলাটের কথা কোনক্রমেই ফেলনা নয়। পুস্তক সজ্জার প্রধানতম অংশ এটি। এর সঙ্গেই পাঠকের প্রাথমিক পরিচয় ঘটে। সঙ্গত কারণেই বইয়ের উপরের শিরোনাম ও তারসঙ্গে রাখা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য, অক্ষরের শ্রী ছাঁদ এবং তার সংস্থাপনের পদ্ধতি নিশ্চয়ই বিচার করার মত বিষয়।

বইয়ের মলাট বাঁধানো একটা সুন্দর ও কার্যকরী কারুশিল্প। কোন পুস্তকে দেখি মলাটের মধ্যে সোনালী রঙে নামলেখা হয়েছে। কাপড়ের মলাটের উপরে দেওয়া হয়েছে সুন্দর রঙ ভিতরে আছে পিজবোর্ড আর তুলোর স্তর। বিখ্যাত প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের এরকম মলাট পুরাতন বইয়ের দোকানে এখনও দেখা যায়। বিখ্যাত একটী ইতিহাসের বইয়ের আগাগোড়া সোনার জলের ফুল আর জ্যামিতিক নক্সা একসময়ে সেটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল সবাইয়ের কাছে। রেক্সিন কাপড়, অসচ্ছ কাপড়ের পাতলা আবরণী। মুগা বা খাদির মলাট এসবও আমরা দেখেছি পর পর। এখনকার দিনে রঙ চঙে কিন্তু অপস্কা ছাপানো কাগজের কমজোরী মলাটই চলেছে বেশী। ছাপানো মলাটের কাগজে চক্ চকে 'ল্যাকার' লাগানো বা প্লাষ্টিকের অতি পাত্‌লা আবরণ সেঁটে দিয়ে তৈরী মলাটও চলছে।

ধুলা আবরক মলাট দেওয়া হয় সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত দামী ও মোটা বইয়ে। এর মধ্যে গ্রন্থাবলীর মলাট, প্রমাণ আকারের আকরগ্রন্থের মলাট একটি অপেক্ষাকৃত সুপ্রচলিত প্রথার প্রবর্তন করেছে। ইংরাজী বইয়ে দেখি বাইরের মলাটেরগোড়ার দিকে ভিতরের অংশে থাকে ক্ষুদ্রাকারে লেখক পরিচিতি ও গ্রন্থ পরিচয়। কোন কোন বাংলা বইতেও এরকম 'ডাই জ্যাকেট' বা ধুলারোধক আবরণীর রেওয়াজ আজকাল চোখে পড়ে।

বাইরের বাড়তি 'ডাই জ্যাকেট' বা আলগা মলাটের প্রসঙ্গে বিদেশী বইয়ের কথা এবং ভারতের নামী ও দামী পর্যায়ের ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের কথা এসে পড়ে। গ্রন্থাগারিক, পুস্তকবিক্রেতা গ্রন্থাগারের নিয়মিত পাঠককুল এই শেষোক্ত ধরণের মলাটের সৌন্দর্য ও নক্সার সুপরিচ্ছন্ন উপস্থাপনার সঙ্গে পরিচিত। গ্রন্থাগারের এধরণের মলাটের কোন প্রয়োজন থাকে না। কোন কোন পাঠগৃহে প্রবেশদ্বারের নিকট কোন স্থানে এই প্রকারের বহিরাবরণকে নূতন বই থেকে খুলে নিয়ে গেঁথে দেওয়া হয় পাঠকদের নবক্রীত গ্রন্থরাশির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। পরে অবশ্য বাইরের মলাট বাইরেই

নিক্ষিপ্ত হয়। অনেক সময়েই শিল্পকলা ও ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন, বিজ্ঞান চিকিৎসা ও ব্যবহার বিধি এবং আরও নানাপ্রকারের বিদেশী প্রকাশনায় বা গ্রন্থরাজিতে অত্যুৎকৃষ্ট অক্ষরগঠনকর্ম, অক্ষর সৌষ্ঠব প্রবর্তন পদ্ধতি ও অলঙ্করণরীতির পরিচয় মেলে। কিন্তু কোন গ্রন্থাগারই তাঁদের প্রতিষ্ঠানে এই সব অপূর্ব মলাটের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের প্রস্তাব যে কলিকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে ও কলিকাতার অল্প কয়েকটি বৃহৎ গ্রন্থাগারে এধরণের সুন্দর মলাট সারাবছর ধরে জমিয়ে শেষে তার থেকে একটা বাৎসরিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হোক গ্রন্থাগারকর্মী ও গ্রন্থাগার পরিষদ, ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে। এধরণের প্রদর্শনী সর্বশ্রেণীর পুস্তক অভিলাষী মুদ্রিত গ্রন্থ প্রস্তুতকারক ও গ্রন্থের রূপসজ্জার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের উৎসাহিত করবে। সাধারণ দর্শককে দেবে আনন্দ।

মলাটের ব্যাপার নিয়ে উৎসাহিত হবার জন্য উন্নাসিক কৃপাদৃষ্টি একেবারেই অবান্তর ও অপেক্ষার যোগ্য। কারণ মলাটের রঙ মলাটের কারিকুরী মলাটের আবরক মাধ্যম ও অগভীর ছাপে তোলা নানান অলঙ্কার বা সোনার জলে বা রূপালী জলের কাজ বাংলার কারু ও চারু শিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। গত দেড়শত বা তার কিছুবেশী সময়ের মধ্যে ছাপা বাংলা বইয়ের কাজ দেখলেই এটা বোঝা যাবে।

তারও আগেকার ঐতিহাসিক যুগের বইয়ের মলাটের ছবিই অনেকক্ষেত্রে তৎকালীন শিল্প ও কৃষ্টিই সম্পর্কে সঠিক পরিচয় লাভের একমাত্র মাধ্যম। পুথির উপরে আবরক ফলক বা কাঠের পাটার ছবিতেই আমরা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বঙ্গীয় চিত্রকলার পরিচয় পাই। এই শ্রেণীর চিত্রিত পাটা রাঢ়দেশ ছাড়াও উড়িষ্যা, মগধ, মিথিলা, নেপাল উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আছে নানান গ্রন্থাগারে ও সংগ্রহে।

আমরা একশিল্প রসিক পুস্তক পাঠককে জানি, যিনি পুস্তকের বহিরাবরণ সযত্নে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর সংগ্রহ থেকে চিত্রাদি বা অক্ষরস্থাপন দেখিয়ে চমৎকৃত করে দিতে পারেন এখনও। কলিকাতার একটি শিল্প সংগ্রহ শালায়ও এধরণের উত্তম মলাট রাখা হত প্রথমের দিকটায়। পরে প্রতিষ্ঠানটি ফেঁপে উঠল। উন্নতি ঘটল তার। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পরিত্যক্ত হল আবর্জনার সমপর্যায়ে নেমে যাওয়া মলাট রাখার 'খেলো' ও 'ছেলেমানুষি' রীতিটি।

এ প্রসঙ্গে একথাও বলা দরকার যে এখনও আমাদের মধ্যে অর্থসামর্থ্যহীন ও বেশী পুস্তক সজ্জার কাজে নিমগ্ন সৃষ্টিবান ও শ্রদ্ধাবান শিল্পী ও কর্মীরা আছেন। আমরা তাঁদের সবিনয় অনুরোধ করব যে তাঁরা যেন মলাট সমেত বাংলাবইয়ের সমস্ত প্রকারের অলঙ্করণ, চিত্রায়ন, ও অন্যান্য অঙ্গসজ্জার বিবর্তন ও শিল্পশৈলী নিয়ে প্রবন্ধাদি লিখে বাংলার মুদ্রণ জগতের ও বই বাঁধাই শিল্পের একটি অবহেলিত দিককে ভবিষ্যতের জন্য রেখে যান।

সন্তোষকুমার বসু

চণ্ডীদাস বিরচিত—শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনঃ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত। নবম সংস্করণ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩০্।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আদি মধ্যযুগের বাঙলাভাষায় রচিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একখানি বৃহৎ কাব্য। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রাচীনত্বের দুই প্রমাণ চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এই দুইখানি গ্রন্থ আবিষ্কারের পূর্বে বাঙলাভাষার ধারাবাহিক গতি-প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে আমাদের ভাণ্ডারে কোন প্রামাণ্য নিদর্শন ছিল না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বসন্তকুমার বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়দ্বয়ের যুগান্তকারী আবিষ্কার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক তাহা প্রকাশের ফলে নিস্তরঙ্গ বাঙলা সাহিত্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিগত ৮২ বৎসর ধরে মাতৃভাষার নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধার ও মৌলিক গবেষণারক্ষেত্রে বাঙালীজাতিকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করে রেখেছে—তথাপি সাহিত্য পরিষদের অবিনশ্বর কীর্তি চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এই দুইখানি লুপ্তগ্রন্থের আবিষ্কার ও প্রকাশের ফলেই বাঙলাভাষার প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সংক্রান্ত মতভেদ অদ্যাপি দূরীভূত না হলেও ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকে প্রামাণিক ও প্রাচীন কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যরূপে স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন। এই শ্রেণীর সমালোচকগণ বড়ু চণ্ডীদাসকে চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে মধ্যযুগীয় বাঙলাসাহিত্যের আদিপর্বে স্থাপন করতে চেয়েছেন। সেদিক থেকে সুপরিস্ফুট বাঙলাভাষার প্রথম গ্রন্থ খুব সম্ভব বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। কেবল ঐতিহাসিক প্রাচীনতার জন্য নয়, নতুন কাব্যরীতির প্রবর্তনের জন্যও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল্য ও গুরুত্ব স্বীকার্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির আবিষ্কারক পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। বসন্তরঞ্জনের সম্পাদনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম সংস্করণ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতার সঙ্গে তিনি এই আকর গ্রন্থখানি সম্পাদনা করে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করে গেছেন। বসন্তরঞ্জন পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ ও ভাষাচর্চায় অতিবাহিত করলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই তাঁর সারস্বতসাধনার বিজয়-বৈজয়ন্তী। বসন্তরঞ্জন যে অতুলনীয় নিষ্ঠা অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পাদনা করেছিলেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের কোনও পুঁথি সেরূপ যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে এ পর্যন্ত কেউ সম্পাদনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

বসন্তরঞ্জনের জীবনকালেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চারিটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অতিশয় যত্ন, যুক্তি-বিচার ও সতর্কতার সঙ্গে তিনি এই চারিটি সংস্করণ সম্পাদনা করেন। প্রায় প্রতিটি সংস্করণে পাঠের

ও টিকার সংস্কার ও পরিমার্জন প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁর তিরোধানের পর শেষ চারিটি সংস্করণ যথোচিত সতর্কতার সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। সেজন্য মুদ্রিত পাঠ টিকা ও বানানের বহু ক্ষেত্রে ভুল বিকৃতি ও বর্ণাশুদ্ধি প্রকট হয়ে হঠেছিল। তদুপরি দীর্ঘকাল ধরে এই গ্রন্থখানির মুদ্রিত সংস্করণ অলভ্য হয়ে পড়ায় ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যানুরাগীসমাজ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রস্তুত নবম সংস্করণ শুধুমাত্র সেই অভাব অসুবিধাই দূর করেনি পরন্তু বহু নতুন তথ্য ও তত্ত্বের সংযোজনে আলোচ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই নূতন সংস্করণখানি অধিকতর আস্বাদ্য ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার আলোচ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নবম সংস্করণখানি সম্পাদনা করেছেন। মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের আদিপর্বে এই আকর গ্রন্থখানির সম্পাদনায় তিনি যে অবিচলিত নিষ্ঠা একাগ্রতা অধ্যবসায় এবং ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেছেন সেজন্য তিনি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পাঠক সমাজে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পূর্ববর্তী চারিটি সংস্করণের তুলনায় এই নবীন সম্পাদনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাঠের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদর্শিত হয়েছে। বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত চারিটি সংস্করণের পাঠ এবং তৎসহ মূল পুঁথির পাঠ মিলিয়ে বর্তমান সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাঠের বিশুদ্ধতারক্ষার অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। বসন্তরঞ্জন যেখানে যেখানে পুথির পাঠের সঙ্গে তাঁর গৃহীত পাঠের বিভিন্নতা দেখিয়েছেন বা পাঠসংস্কার করিয়াছিলেন বর্তমান সংস্করণে তা যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে। এই নূতন সংস্করণে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ ও টিকার গৌরব কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। পুথির পাঠের সঙ্গে বসন্তরঞ্জনের বিভিন্ন সংস্করণে গৃহীত পাঠে যে সব বৈসাদৃশ্য আছে বর্তমান গ্রন্থ-সম্পাদক তা মূলে অথবা টীকা টিপ্পনীতে উল্লেখ করেছেন: প্রকৃত প্রস্তাবে বসন্তরঞ্জনের তিরোধানের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এবং বাজারে প্রচলিত কিছু কিছু ছাত্রপাঠ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংস্করণের পাঠে যে সব বিকৃতি ও প্রমাদ বাসা বেঁধেছিল নবম সংস্করণে গ্রন্থসম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার অশেষ যত্নসহকারে পাঠ সম্পর্কিত ঐ সব ত্রুটি-বিচ্যুতির অপনোদন করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্তমান নবম সংস্করণের আকর্ষণীয় সংযোজক বসন্তরঞ্জনের জীবনকাহিনী। বসন্তরঞ্জনের মৃত্যুর প্রায় ২২ বৎসর পরে ও তাঁর কোন প্রমাণ্য জীবনরচিত রচিত হয়নি। সাময়িক পত্রে তাঁর জীবনমূলক কিছু নিবন্ধ প্রকাশিত হলেও তা সর্বত্র নির্ভরযোগ্য নয়। দুঃখের বিষয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেবায় নিবেদিত-প্রাণ বসন্তরঞ্জনের জীবন ও সাহিত্য সাধনার পরিচয় সাহিত্য সাধক চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বিলম্ব হলেও শ্রীমদনমোহন কুমার এই নূতন সংস্করণে বসন্তরঞ্জনের বিস্তৃত এবং প্রামাণিক জীবনী সংযোজন করে পরিষদের কলঙ্ক ক্ষালন করলেন। বসন্তরঞ্জনের একখানি প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য জীবনবৃত্তান্ত প্রণয়নের জন্য তিনি পথিকৃতের গৌরব অর্জন করবেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নবম সংস্করণের সঙ্গে সংযোজিত এই জীবন বৃত্তান্ত পাঠকদের কাছে একটা বড় লাভ। বসন্তরঞ্জনের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহে শ্রীকুমার ব্যাপক অনুসন্ধান করেছেন—পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করেছেন মুদ্রিত এই নবম সংস্করণের প্রত্যেক পৃষ্ঠা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নবম সংস্করণের বিষয় সূচীতে আছে প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত আচার্য্য রমেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেদী লিখিত 'মুখবন্ধ', চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের পুনর্লিখিত ভূমিকা। গৌড়বঙ্গে লিপিবিদ্যা বিষয়ে পথিকৃৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের বিষয় সূচী ও পদসূচী, ভাষাসর্বস্ব টীকা ও শব্দসূচী, অধিকন্তু আচার্য্য শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'পরিষদ সভাপতির নিবেদন'। গ্রন্থ সম্পাদক শ্রীকুমার নবম সংস্করণের ভূমিকায় কেবলমাত্র বসন্তরঞ্জনের বিস্তৃত জীবন বৃত্তান্তই পরিবেশন করেন নি। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনপুথি, পুথির ভাষা, বসন্তরঞ্জনের বংশতালিকা, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিষয়ক বহু অজ্ঞাত তথ্যে কৌতূহলী পাঠকের চিত্ত বিনোদন করেছেন। এই সংস্করণের আরও আকর্ষণ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের অপ্রকাশিত পূর্ব আলোকচিত্র। অন্যান্য আলোকচিত্রের মধ্যে বসন্তরঞ্জনের স্বহস্ত লিখিত কড়চার পাণ্ডুলিপি, ব্যোমকেশ মুস্তাফী ও আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর পত্র, বসন্ত রঞ্জনের পত্র এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন পুথির একখানি পৃষ্ঠার হাফটোন ফটো। বস্তুতঃপক্ষে শ্রীমদনমোহন কুমার সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই নবম সংস্করণ বসন্তরঞ্জনের গৌরবকে অবিকৃত রেখেও বিশেষ যত্ন ও অভিনিবিশের সঙ্গে সম্পাদিত হওয়ায় যথার্থ নূতন গ্রন্থের গৌরবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। গ্রন্থখানির কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই সুন্দর। এইরূপ একখানি প্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থের সার্থক সম্পাদনার জন্য গ্রন্থ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার বঙ্গভাষী ও সাহিত্যানুরাগী সমাজের অকুণ্ঠ সাধুবাদ ও প্রশংসা লাভ করবেন এতে সন্দেহ নাই।

হারাধন দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

পুরাকীর্তি গ্রন্থমালা

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি

রচনা : শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মূল্য : ৩'৭৫ টাকা

●

বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি

রচনা : শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী মূল্য : ২'৫০ টাকা

●

কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি

রচনা : ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মূল্য : ৪'০০ টাকা

প্রত্যেকটি বই পুরাবস্তুর বিশদ বিবরণে সমৃদ্ধ ও বহু উৎকৃষ্ট আলোকচিত্রে সজ্জিত। ঝকঝকে সচিত্র প্রচ্ছদ, সুদৃঢ় বাঁধাই, উত্তম ও দীর্ঘস্থায়ী কাগজ, উৎকৃষ্ট ছাপা। যাবতীয় তথ্য সংবলিত মানচিত্র আছে প্রত্যেক বইতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়ের অধীক্ষকের কাছ থেকে পাইকারী খরিদের ক্ষেত্রে পুস্তক-ব্যবসায়ীরা ২০% কমিশন পাবেন।

●

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

প্রকাশন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়
৩৮, গোপালনগর রোড
কলিকাতা-২৭

প্রকাশন বিক্রয়-কেন্দ্র
নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবন
১, কিরণশংকর রায় রোড
কলিকাতা-১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) ৮২০৮/৭৪